উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়

করকমলেষু

গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য বই

জুপিটার

পুনরাবৃত্তি

রঞ্জনরশ্মি

শূন্যের অংক

প্রতিদিন

প্রেম:

সপ্তসাগর

হাসিকান্নার দিন

ঊষা-অনিরুদ্ধ

ও

হৃদয়ের মৃত্যু

ভূমিকা

'শ্রীলতা ও সম্পা' আমার পরিকল্পিত 'রায়বাড়ী' নামের চতুর্ম্মুখ উপন্যাসের দুইটি মুখ মাত্র। 'শ্রীলতা' অংশ শারদীয়া 'গল্পভারতী' পত্রিকার ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত হয় 'লর্ড মেয়র' নামে। 'সম্পা'-অংশ পরের বছর ১৩৫৬ সালের শারদীয়া সংখ্যা 'গল্পভারতী'তেই বা'র হ'ল। দুটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ সংরক্ষিত খণ্ড উপন্যাসের রূপে ছিল। আরও দুই খণ্ড লেখা হ'লে চারখণ্ডে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হ'বে, এই ইচ্ছা ছিল। তাই, পাঠকবৃন্দের সহৃদয় ঔৎসুক্য সত্ত্বেও এতদিন 'শ্রীলতা ও সম্পা' প্রকাশিত হয়নি। কারণ, আমার মত অলস লোকের দ্বারা উপন্যাসের বাকী অংশ লিখে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। এতদিনেও যখন লেখা হ'লনা, তখন ভবিষ্যতে হবে কিনা বুঝতে পারলাম না। 'মিত্র ও ঘোষের' আগ্রহে তাই অসমাপ্ত উপন্যাসেরই প্রথম খণ্ড আজ প্রকাশিত হ'ল।

বনিয়াদী জমিদার রায়বাড়ী। বিচিত্র-জীবন ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত্র আধুনিক জগতের পটভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে। অতীতের প্রাচুর্যের পরে বর্তমানের দারিদ্র্য কোথায় বিরোধ সৃষ্টি করে ও বর্তমানের সঙ্গে প্রাচীনেরই বা কোথায় বিরোধ, কোথায় বা সামঞ্জস্য—এই উপন্যাসের চার খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় সেটাই। প্রাচীন পরিবারে পরবর্তী পুরুষের কাছে চিরপ্রচলিত সংস্কার ও ঐতিহ্য কতটা গ্রহণীয়, কতটা বর্জনীয়, চিন্তার কথা। সংস্কার, আশৈশব শাসন ও পরিবেশ আধুনিক ধারাকে সর্বতোভাবে কি বংশপরম্পরার পথে চালায়? প্রতিক্রিয়াশীল রক্তের মধ্যে সুপ্ত থাকে সংগ্রাম। জরাজীর্ণ প্রাচীনের বিপক্ষে তরুণের বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ হতে পারেনা, বহু ক্ষেত্রেই পুরাতনকে স্বীকার করে নিতে হয়। সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কতদূর সম্ভাব্য, হয়তো অলিখিত শেষ খণ্ডে বলা হ'ত। প্রাচীন আভিজাত্যের গর্বকে আধুনিক জগতের ব্যবহারিক সুখের আশায় বিসর্জন দেওয়া চলে কি? প্রেম কি বিদ্রোহে শক্তি কোথায়? নূতন যুগের বংশধরের কাছে পুরাতন যুগ কেমন লাগে, অভ্যাস তাদের কি শিথিল আরামে চিরাভ্যস্ত ছকের আয়ত্তে বেঁধে রাখতে পারে? এ সব প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। তাই দুইতিন বংশানুক্রম ধরে রায়বাড়ীর ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করেছি।

আমার লেখা 'প্রেম' উপন্যাস বা 'সপ্তসাগর' রচনাসংগ্রহে প্রকাশিত 'উপসংহার' উপন্যাসখানির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন, তাঁরা 'শ্রীলতা ও সম্পার' ভাষা ও আঙ্গিকের প্রাচীনত্বে হয়তো বিস্ময় বোধ করবেন। আধুনিক রচনার বিশ্লেষণী-ভঙ্গি ও মনস্তত্ত্ব প্রাচীন ভাষা ও আঙ্গিকে কতটা রক্ষা করা যায়—এ-ও একটি পরীক্ষা। প্রকাশকেরা বলেন, চলতি ভাষায় লেখা বই পূর্ববঙ্গের সকল পাঠক বোঝেন না। প্রাচীন লিখনভঙ্গী যে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে, সেটাও অভিপ্রেত নয়।

এসব কারণ ভিন্ন আরও কারণ আছে। মনে হয়, রচনাকার মাত্রেরই বিভিন্ন ভাষা ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করে যাওয়া উচিত এবং বিভিন্ন রচনার ভাষা ও আঙ্গিক হওয়া উচিত বিভিন্ন। একঘেয়ে ভাষাভঙ্গীর দাসত্ব করে যাওয়া নিজেকে পুনরাবৃত্তি করা মাত্র। প্রাচীন যুগের পরিবেশে তাই প্রাচীন রীতি গ্রহণ করলাম। শিল্পীর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত পরীক্ষা করে যাওয়া সমীচীন—তা সে সফল বা বিফল, যাই হোক না কেন।

শ্রীলতা ও সম্পার জীবনকাহিনী বা সমস্যা এখানে শেষ হয়নি। নূতন জগতে কিসের নির্ভরে স্থানলাভ করা যায়, রায়বাড়ীর প্রকৃত গলদ কোথায়, এ সমস্ত অলিখিত দুই খণ্ডে হয়তো বলা হ'তে পারে। কিন্তু, বলা আদৌ হবে কিনা আমি জানি না। গল্প শেষ করার দায় আমি নেব না। যদি শেষ না-ই হয়, তিলমাত্র ক্ষতি হবে না। জগতে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বাণী রায়

শ্রীলতা ও সম্পা

লর্ড মেয়র

"Turn again—
Lord Mayor of London."

এখানে শ্রীলতার গল্প

—"তোমাদের বাড়ীর পাশে ওই গলিটাতে থাকতাম। পাঁচভাই ছয়বোনের একজন। দেখতাম তোমাদের গাড়ী চড়ে বেড়াতে যেতে। তখন থেকেই ইচ্ছা ছিল তোমাদের কাছে আসি।"—

—"যুদ্ধের বাজারে কণ্ট্রাকটারের অফিসে ঢুকে পড়লাম। বর্মাতে চালের অভাব। কিছু টাকা সংগ্রহ করে চালের ব্যবসাতে নামলাম। তার পরে আজ আমি আমি।"—

—"অমিয়, আমরা একমাসে, একবছরে জন্মেছি। ভগবান আমাদের বন্ধু হবার জন্যেই তৈরী করেছেন, ভাই। চিরদিনের ইচ্ছা ছিল। যখন তোমাদের চারতলার ছাদে ঘুঁড়ি ওড়াতে, গাড়ীবারান্দায় লাট্টুর প্যাঁচ কষতে, তখন রাস্তা থেকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতাম। সওদাগরী অফিসের কেরাণীর ছেলে, জমিদার বাড়ীতে ঢুকতে সাহস পাইনি। ছেঁড়া প্যাণ্ট, বোতাম-খোলা সার্ট দেখে, অমিয়, তুমি তখন ঘৃণা করতে পারতে। এখন ষোল হাজার টাকার গাড়ীখানা বাড়ীর সামনে দাঁড় করাতে পেরেছি বলেই এই সোফায় বসবার অধিকার জন্মেছে।"—

শ্রীলতার বঙ্কিম ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বঙ্কিম অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে অসন্তোষের ছায়া পড়িল। শ্রীলতার সমস্ত কিছু বঙ্কিম। তাহার বঙ্কিম নয়ন, বঙ্কিম অধর, বঙ্কিম চিবুক। ক্ষীণ কটি ও কৃষ্ণ কেশেও এই বঙ্কিমতা লেখা আছে। মনোহারিণী সর্পী।

শ্রীলতার বড় বৌদি জয়া ভদ্রতা জানাইল, "সত্যি, আপনার মত উন্নতি কজন করতে পেরেছে, বলুন? এই বার বিয়েটা করে ফেলুন। এত ঐশ্বর্য ভোগ করবে কে?"

দীপঙ্কর লাহিড়ী নিজের স্বল্প-কেশ মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "বত্রিশে টাক পড়েছে, বৌদি! কে মেয়ে দেবে?"

জয়ার স্বামী মহেন্দ্র মন্তব্য পাশ করিল, "টাকায় টাক।" দীপঙ্কর চকিতে শ্রীলতার দিকে চাহিল, "টাকা দেখে সকলে ভোলেনা, দাদা।"

শ্রীলতা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, সহসা বাহির হইয়া গেল নিঃশব্দে। অসহিষ্ণু পদের লাল মখমলের চটীর কোণে বসিবার ঘরের কার্পেটের একটি দিক উল্টাইয়া রহিল স্মরণ করাইতে যে, একটু পূর্বেই এই স্থানে একটি সাতাশ বছরের আত্মাভিমানিনী তরুণী বসিয়াছিল। কিন্তু, মখমলের চটিটি জীর্ণ-সংস্কৃত, কার্পেট জরাগ্রস্ত।

দীপঙ্করও উঠিয়া দাঁড়াইল। তাম্রবর্ণ, রৌদ্রদগ্ধ, সবল-দীর্ঘদেহে কায়িক পরিশ্রম ও আলস্যের অভাব লিখিত আছে। "আমিও চললাম। লরিগুলো ঠিকমত সারছে কি না দেখতে হচ্ছে।"

দীপঙ্করের গাড়ী চারতলা রায় বাড়ীর সম্মুখ হইতে অপসারিত হইয়া গেল।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মেয়েটা যে কি!"

জয়া বিদ্রূপ করিল, "টাকার অভাবে রাজকন্যের বিয়ে হচ্ছে না, অথচ কথায় কথায় মান যায়।"

শ্রীলতার ছোট বোন সম্প্রীতি বলিল, "টাকা না থাকলেও তো মান আছে বৌদি। সেটা তো অবহেলার বিষয় নয়।"

জয়া নিরস্ত হইল। কারণ কেবল রূপের জোরে সে সম্পূর্ণ সাধারণ ঘর হইতে রায়বাড়ীর বধূ পর্যায়ে আসিয়াছে। জয়ার ম্লান মুখ লক্ষ্য করিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু মানের সঙ্গে যে এখনও চার বোন বিয়ের বাকী আছে।"

জীর্ণ-সংস্কৃত মখমলের চটি এবং জরা-গ্রস্ত কার্পেট রায়বাড়ীর বর্তমান অবস্থার মূল সুর। প্রাচীন বনেদি বংশে অত্যধিক সন্তানের আবির্ভাবে ও উপার্জনের অভাবে সঞ্চয়ে ভাঙন ধরিয়াছে, কিন্তু সম্পদ নাই বলিয়াই যেন মানের গলায় দড়ি দিয়া তাহাকে ভালভাবে বাঁধিয়া রাখিবার দুরন্ত প্রচেষ্টা। মানের আড়ম্বর দেখাইয়াই যেন অর্থাভাবকে চাপা দেওয়া চলিবে।

রায়বাড়ীর বর্তমান অবস্থা দেখিলে আমার মনে হয় যেন একটি ঘোড়ার রেস দেখিতেছি। উচ্ছৃংখল অশ্ব বল্গার শাসন অমান্য করিয়া পৃষ্ঠারূঢ় ক্লান্ত সওয়ারকে

বারে বারে ভূপাতিত করিতে চায়। অশ্বারোহী জীবন-মরণ পণে দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘোড়ার বল্গা আঁকড়াইয়া কোন মতে ঝুলিয়া আছে। তাহারও শান্তি নাই, ঘোড়ারও শান্তি নাই। পলাতকা আভিজাত্যকে ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা ওই ঘোড়ার রেস।

শ্রীলতা দ্বিতলে নিজের গৃহে প্রবেশ করিল। দামী সেকেলে কাঠ, পালিশের অভাবে কালো বার্ণিশ পুড়িয়া গিয়াছে। মেঝেতে খাটের নীচে পুরাতন একটুকরা সতরঞ্চি বিস্তৃত। কার্পেটের অভাব, অথচ আবহমান ওইখানে কার্পেট বিছানো নিয়ম ছিল। পুরাতন অথচ দামী টেবিলে কাগজপত্র, বই খাতা সাজান। একপাশে একটি সেল্‌ফে প্রসাধনের ও সেলাইয়ের সরঞ্জাম। সম্মুখে ছোট হাত-আয়না দেওয়ালে ঝুলিতেছে। একখানি জীর্ণ বেতের-ছাউনী চেয়ার। টেবিলের আচ্ছাদনী, খাটের আস্তরণীতে পুরাতন কাপড়ে হাতে-বোনা লেস দিয়া সৌষ্ঠব সম্পন্ন করা হইয়াছে। বিশাল ঘরে অন্য আসবাব নাই। খাটের নীচে তোরঙ্গে কাপড়চোপড় থাকে।

পিতৃপুরুষের আমলের বৃহৎ বাড়ীতে প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা থাকিলেও আসবাবপত্র কিনিবার সামর্থ হয় নাই। তাই একগৃহ ভাঙিয়া দশ গৃহ গড়িতে হইয়াছে।

সেল্‌ফ হইতে ব্লাউজের হাতার অসমাপ্ত কাজটি তুলিয়া শ্রীলতা চেয়ারে বসিল। বাহিরে লোকজনের মধ্যে তাহার সৌখীন নাম আছে। একমাত্র অন্তর্যামী জানেন এই সৌখীনতা বজায় রাখিতে কতটা পরিশ্রম করিতে হয়। পদ্মের ন্যায় রক্তাভ অঙ্গুলীগুলি সূচের খোঁচায় জর্জরিত। সাবান ও ইস্ত্রির ব্যবহারে হস্তদ্বয় সুকঠিন হইয়া গিয়াছে। দাসদাসী নহে, এমন কি সর্বদা দরজী ও ধোবা পর্যন্ত নহে, নিজের হাতে নিজের প্রত্যেকটি কাজ করিতে করিতে শ্রীলতা ক্লান্ত। সুসজ্জিতা শ্রীলতা রায়কে দেখিলে মনে হয় যে পায়ের জুতাটিরও বুরুশ করিয়াছে, শ্রীচরণে পরাইয়া দিয়াছে কোন বেতন-ভোগী সেবক-সেবিকা। কিন্তু কিছু পূর্বেই দেখিয়াছি করুণ মুখে শ্রীলতা হাতে জুতার কালি ঘসিয়া তুলিতেছে। তবু, বংশমর্যাদা ভুলিতে পারে না সে। সমগ্র বাড়ীটীর সম্মান ও শালীনতা প্রাণপণে লোকচক্ষুতে বজায় রাখিবার দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিয়াছে শ্রীলতা নিজে। মাতাপিতা বার্দ্ধক্যে অশক্ত, কক্ষের বহির্চারণ সাধারণতঃ করেন না। তিন ভাই-বৌ অত্যন্ত সাধারণ এবং নিঃস্ব ঘরের কন্যা। জমিদার বাড়ীর আদবকায়দা সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা নাই। বড় বোনেদের বিবাহ হইয়াছে। ছোটবোনেরা ছোট। বিবাহিত ভাই-রা সংসার লইয়া এবং কুমারেরা নিজের জগৎ লইয়া ব্যস্ত। শ্রীলতার কোন কাজ নাই।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করিয়া শ্রীলতা বেশী পড়িতে পারে নাই। সাধারণ ঘরের মেয়েদের মত সাধারণ কলেজে আই-এ, বি-এ পাশ করা তাহাদের সাজে না, অথচ এখনও পাঁচটি ভাই বোনের শিক্ষা বাকী। সুতরাং লোক মধ্যে প্রচার করা হইল, 'শ্রীলতার শরীর খারাপ। এখন পড়বেনা ও।'

জীবনে শ্রীলতার মাথাটিও ধরে নাই। তবু এই রুগ্ন অপবাদকে সে মাথা পাতিয়া লইল।

শ্রীলতার বন্ধু নাই। পাড়ার কোন মেয়েকে সে সমকক্ষ মনে করে না। বিজন অরণ্যে গোক্ষুরের মত সে নিঃসঙ্গ। তাহার মনোহারিত্ব ভীতিপ্রদ। কাছে যাইয়া স্পর্শ করা চলে না। হাত লাগিলে নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা...সে ড্রেসডেন্ চায়না।

সম্প্রীতি দিদির গৃহে প্রবেশ করিল। সে জুনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করিয়াছে। ইহাকে আরও কিছুদিন পড়ানো হইবে। কিশোর বালকের মত দ্বিধাশূন্য, সরল ব্যবহার ও বচনবিন্যাস তাহার। পরিধানে কামিজ ও সালোয়ার। হাত নাড়িতে নাড়িতে সম্প্রীতি বলিল, "দিদি ভাই, তুমিও চলে এলে অমনি দীপঙ্করদা vanish করলেন। Gone in a mo'."

শ্রীলতা সেলাই হইতে দৃষ্টি তুলিল,—"সম্পা, আবার মিঃ লাহিড়ীকে দাদা বলছিস?"

"বলতে যখন হবেই একদিন, তখন অভ্যাস রাখা ভাল আগে থেকেই। তাছাড়া তিনি ছোড়দার বন্ধু।"

অর্দ্ধচন্দ্রের সঙ্কীর্ণ ললাট শ্রীলতার, চোয়াল সামান্য উঁচু, চিবুক তীক্ষ্ম। সমস্ত মুখটির ভঙ্গি কিন্তু অস্বস্তিকরভাবে কেউটিয়ার ত্রিকোণ ফণার কথা মনে আনিয়া দেয়। সরু বঙ্কিম নয়নের দৃষ্টিও তাই।

"বলতে হবে মানে? তোমাদের কি বিশ্বাস যে আমি ওই লোকটাকে বিয়ে করব?"

"নয় কেন? নয় কেন? নয় কেন শুনি।" সম্প্রীতি নৃত্যছন্দে গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

"ওকি মানুষ? প্রতিটি কথায়, ব্যবহারে নিজের বিজ্ঞাপন। সব সময় নিজের কথা। দেখলেনা কি ভাবে গাড়ীখানার দাম আমাদের শুনিয়ে দিল?"

"তাতে কি, দিদি? বড়দি, মেজদির স্বামী থেকে তোমার স্বামী এমন কি মন্দ হ'বে?"

"জামাইবাবুদের সঙ্গে তুলনা কোরনা, সম্পা। তাঁরা কত বড় ঘরের ছেলে, তাঁদের কালচার আছে।"

"যথেষ্ট কালচার! মুখে 'আজ্ঞে, আচ্ছা' করে কথা। বিনয়ের অবতার! স্বভাব-চরিত্র চাষারও অধম।"

"যা বোঝনা আলোচনা কোরনা, সম্পা। চরিত্র ব্যক্তিগত জিনিষ। তাঁরা ব্যবহার জানেন।"

সম্প্রীতি খাটে বসিল, "দিদি, সমালোচনার দিন আমাদের নেই। তোমার তো যথেষ্ট কালচার আছে, তোমার বিয়ে হচ্ছেনা কেন?"

পলকে শ্রীলতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ঔষধি-প্রয়োগে দুর্দান্ত সর্প নিবীর্য ফণা নামাইয়া মুহূর্তের জন্য মলিন হইয়া রহিল। পরক্ষণেই আবার ক্রুদ্ধ কেউটিয়া মাথা তুলিল। সাপের গর্জনের মত চাপা সুরে শ্রীলতা গর্জন করিয়া উঠিল,— "সাবধান, আমার বিয়ে সম্বন্ধে তোমার মুখে একটি কথাও শুনতে চাইনে। ছোট ছোটর মত থাক।"

দুই

আজ শ্রীলতার তিন জামাইবাবু এ বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, কারণ আজ জামাই ষষ্ঠী। এই ভোজের আয়োজনের খরচ তুলিতে ঠিক একমাস চলিয়া যাইবে কার্পণ্যে বিভিন্ন দিকের। তবু কোন একটি ত্রুটি রাখিলে চলিবে না।

নানা আকারের থালা-বাটি বাহির হইয়াছে। বাড়ীর মেয়েরাই মাজিয়া ঘসিয়া রাখিতেছেন। দুইটি মাত্র চাকর। তাহাদের পক্ষে বিরাট বাড়ীর পরিচর্যা শেষ করিয়া বাড়তি কাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। ঠিকা ঝি দুইজন বাঁধা-ধরা কাজগুলি করিয়া যায়। অভ্যাগত-সমাগমে বিপত্তি ঘটে বাড়ীর মেয়েদের।

সম্প্রীতির ভার পড়িয়াছে কার্পেটের আসনগুলি বাছিয়া বাহির করিয়া রাখা। অর্থাৎ, জীর্ণ আসনকে ভদ্রোচিত করিয়া তোলা। সকলের ছোট বোন মালতী চোখের জল মুছিতে মুছিতে পানের পাট লইয়া বসিয়াছে। পান খাইতে লোক আসিবে,

সাজিবার কেহ নাই। অথচ মালতীর ক্লাশের পড়া তৈরী হয় নাই। মালতীর বয়স বার। সে এবং চোদ্দর দিদি বিনতা পাড়াতেই একটি সাধারণ স্কুলে পড়ে। বাহিরে প্রচারিত করা হইয়াছে, দূরে স্কুল বলিয়া বর্তমানের গোলমালে ছোট মেয়ে দুটিকে কনভেণ্টে দেওয়া হয় নাই। শীঘ্রই হইবে। সম্প্রীতির পড়া শেষ এবং শ্রীলতার বিবাহের উপর ছোট বোনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। গভর্ণেস্ রাখিয়া কন্যা-বধূকে ইংরাজী শিখানো রায়-বাড়ীর আবহমান কালের নিয়ম ছিল। বড়বধূ ও কন্যা শ্রীলতা পর্যন্ত চলিয়াছে। সম্প্রীতি মেমী স্কুলে পড়ে, শিক্ষা আপনি হয়। ছোট দুই বোনকে শ্রীলতা অবসর সময়ে ইংরাজী শিখাইয়া নিয়ম রক্ষা করে।

রায়-বাড়ীর বনেদী চাল আমার কৌতুক জাগায়। এককালে যাহা হইয়াছে, সযত্নে এখন পর্যন্ত সেই সব মান্ধাতা রীতি-নীতিকে অনুসরণ করা হয়। বিন্দুমাত্র চ্যুতি-বিচ্যুতি অমার্জনীয়। এককালে পল্লীগ্রামবাসী প্রাচীন জমিদার বংশ বিদেশী রাজপুরুষকে খাতির করিয়া চলিত। তাই ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী চালচলন অবশ্য শিক্ষণীয় গরিমার বিষয় ছিল। ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে তোয়াজ করিয়া গর্বান্ধ ইংরাজের পদচ্ছায়াতলে প্রজার সর্বস্ব অপহরণ সেকালের ভূম্যধিকারীর স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারে পর্যবসিত হইত।

সে দিন নাই। আজ খদ্দরধারীই রাজপুরুষ, আজ নগ্নপদ সন্ন্যাসীর অহিংসা-মন্ত্রে জগৎ দীক্ষিত। তবু রায়-বাড়ীতে ইংরাজি শিক্ষার জয়ধ্বজা। বাহিরের খোলস ওই অপসৃয়মান ইংরাজশক্তির অন্ধ অনুসৃতি। অন্তরে ফল্গুধারার প্রবাহ প্রাচীন পরিবারের সাবেকী হিন্দু চাল ও বংশ-কৌলিন্যের অভিমান। সব মিলিয়া অদ্ভুত রায়-বাড়ী।

প্রাচীন প্রথাকে বুলডগের একগুঁয়েমীতে কামড়াইয়া ধরিবার প্রচেষ্টা দেখিয়া পটভূমিস্থিত মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হইতে ইচ্ছা জাগে। আমার মনে উত্তর আসে। এককালে অর্থ ও সামর্থে রায়-বাড়ী বরেণ্য ছিল। সে দিন নাই। তবু আশা আছে হয়ত সেদিন আবার ফিরিতে পারে। সে দিনে যাহা অনুসরণীয় ছিল, যুগ পরিবর্তন হইলেও বিশ্বাসীর আশ্বাস তাহাতেই নিহিত। আগামী কালের রক্ত উষার প্রতি লক্ষ নাই রায়-বাড়ীর। অন্ধকার অতীতে পূর্বতন সত্তার একাগ্র উপাসনা করিতেছে তাহারা ঃ—

"ত্বমেকং শরেণ্যম
ত্বমেকং বরেণ্যম—"

এই আত্মরতি শ্রীলতা রায়তে পূর্ণ বিদ্যমান। চলুন, শ্রীলতার ঘরে যাই।

সমস্ত ঘরটিতে আত্মপ্রীতির লক্ষণ পরিস্ফুট। শ্রীলতার জগতে সে শক্তি আসে নাই—যাহার আবির্ভাব কুমারীর নার্সিসাস্ সত্তাকে এক নিমেষে বিদূরিত করিয়া প্রেমের আত্মবিস্মরণ শিখাইতে পারে। নিজেকে সজ্জিত করিবার, নিজেকে আনন্দ দিবার সরঞ্জামে গৃহ পরিপূর্ণ। দুই একখানি ছবি যাহা আছে, নিজেরই নানা ভঙ্গির আলোক-চিত্র। আমি মনে মনে ভাবিতাম, কবে দেখিব শ্রীলতা নিজের ছবির গলাতে বেলফুলের মালা পরাইতেছে।

শ্রীলতা এখন খাটে বসিয়া কিউটেক্স্-প্রসাধনীর সাহায্যে নখর-বিলাস করিতেছে। পুরাতন সংবাদ-পত্র বিস্তৃত, রং অথবা নখের অতিরিক্ত কর্তিত অংশ ধরিবার উদ্দেশে। সম্প্রীতি একখানা কার্পেটের আসন দুলাইতে দুলাইতে বলিল, "দিদি, ডার্লিং, এটা একটু 'শিলিয়ে' দাওনা। কি করে যে এত ছেঁড়া শেলাই করব বুঝতে পারিনা। এর কি আছে?"

"ফেলে দে"—শ্রীলতার পরামর্শে সম্প্রীতি হাসিল, "ভাল করেই জান, তা চলবেনা এ বাড়ীতে। গলিত ন্যাকড়াও সঞ্চয় করে রাখা হবে, যদি জোড়াতালি দিয়ে কোনো মতে ভদ্রজনোচিত কিছু তৈরী হয়।"

"জোড়াতালি দিয়ে আর চলতে পারি না। আমাদের জীবনের কী-নোট হয়েছে এই জোড়া দেওয়া"—ফাইল্ দিয়া শ্রীলতা হাতের নখ ঘষিতে ঘষিতে বলিল।

"জোড়া তো সহজেই এড়াতে পার তুমি। মুখে একবার 'হ্যাঁ' বল্লেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।"

ক্রুদ্ধা নাগিনীর বিদ্বেষে শ্রীলতা বলিয়া উঠিল, "আবার ওই কথা? একটা চালিয়াৎ ঠিকেদার!"

"সেই চালিয়াৎ ঠিকেদারের অফিসে একটা কাজের আশায় তো তোমার ভাই-এরা লালায়িত, দিদি। ওসব কথা আমাদের মুখে সাজেনা। তোমার বিয়ে হয়ে গেলে একটি 'mouth, less to feed' হ'বে। তুমি যে নামমাত্র মাসোহারা পাচ্ছ, আমি পাব, being the eldest unmarried daughter. আমি আবার তখন তোমার মত বিয়ের বাজারে চড়ে থাকব। বিনতা, মালতী ভাল স্কুলে পড়তে পাবে। বিরাট গাড়ী থামিয়ে, তুমি দিদি, শ্বশুর বাড়ী থেকে দেখা করতে আসবে। রায়-বাড়ীর মুখ

উজ্জ্বল হ'বে। সবচেয়ে বড় কথা। আত্মীয় হিসাবে দীপঙ্কর লাহিড়ী অনেক করবে। তোমার বিয়েতে একটি পয়সা পণ লাগবে না। কত সুবিধে ভেবে দেখ।"

"সম্পা, তোমার উপদেশাবলী বন্ধ করতে পার। দীপঙ্কর লাহিড়ীকে আমি বিয়ে করব না।"

"তোমার অন্য উপায় নেই। দীপঙ্করের অনেক টাকা।"

"টাকা আছে, কিন্তু শিক্ষা নেই! কালচার নেই, পালিশ নেই। টাকার গল্প করে সব সময়।"

কার্পেটের আসনে সাবধানে সূচ চালাইতে চালাইতে সম্প্রীতি টিপিয়া কহিল, "আহা, পালিশ নেই বলেই তো তোমার পালিশে তার লোভ। নইলে কি একটা অসাধারণ তুমি?"

শ্রীলতা হতাশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আমি তো একটা কাজ নিতে পারি। সত্যি আমরা কাজ করিনা কেন অন্য দশটা মেয়ের মত?"

"কাজ কে দেবে আমাদের? অফিসে কাজ চায় অফিস-সজ্জা চায় না। তা, দীপঙ্কর লাহিড়ীর সেক্রেটারী মেমসাহিব সাতশো বেতন পান। চেষ্টা করে দেখ ওই পোষ্ট্‌টার জন্যে।"

"রাঙাদি, ঘরে বসে কেন? খাওয়া হবে বাড়ীতে, দেখাশোনা করছনা যে বড়?" হাঁটু পর্যন্ত ফ্রকপরা মালতী ও বিনতা প্রবেশ করিল।

"মা-ই তো বেরিয়ে দেখছেন। আমার দেখার দরকার কি?"

শ্রীলতা কিউটেকসের নখের-রং নখের উপর বুলাইতে লাগিল।

"একটু নেল-পলিশ দাও তো রাঙাদি"—বিনতা হস্ত-প্রসারণ করিল।

শিশিতে সামান্য তলানী রং যাহা ছিল তাহাতে দুইজনের হাত পায়ের চল্লিশটি নখ রং করা চলে না। তবু, নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীলতা বিনতার হাতে ছোট শিশিটি তুলিয়া দিল। দ্বিতীয় শিশি কিনিবার সামান্য পয়সাও হাতে নাই। অথচ ছোট বোনদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা হয়না।

"ওঃ, রাঙাদির কি মজা! দীপঙ্করদার চারখানা গাড়ী!" মালতী আনন্দে হাততালি দিল।

"তাতে আমার কি?" শ্রীলতা খাট ছাড়িয়া মেঝেতে নামিল। কাল-টানা সাদা ডুরের স্খলিত অঞ্চল গায়ে তুলিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল, "ওকে বিয়ে করার আগে গলায় দড়ি দেব।"

তিন

পোলাউ একমুঠো মুখে তুলিয়া বড় জামাই একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বেশ দৃশ্যগত ভাবেই পোলাউ থালার একপাশে ঠেলিয়া পাশের রুপার রেকাবী হইতে দুইখানি লুচি তুলিয়া মাংসের সহিত মিশাইলেন।

দ্বিতীয় জামাই কিছুক্ষণ বিষণ্ণ বিমনা ভাব দেখাইয়া অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে বলিলেন, "আমার শরীরটা ভাল নয়। পোলাউ খেতে ইচ্ছে করছেনা।"

জয়া তাড়াতাড়ি দরজার বাহিরে দণ্ডায়মান রাঁধুনি ঠাকুরকে ইসারা করিল। আরও লুচি আসিল। বৃদ্ধা রায়-গৃহিণী একখানি মার্বেল পাথরের জল-চৌকির উপর উপবিষ্ট অবস্থায় সকলের আহারের তদারক করিতেছিলেন। মরমে মরিয়া কহিলেন, "পোলাউর ভাল চাল কিছুতেই যোগাড় করতে পারিনি, বাবা। তাই ভাল হয়নি।"

তৃতীয় জামাতা সোৎসাহে বলিলেন, "আজ্ঞে, বেশ ভাল হয়েছে পোলাউ। আমার তো বেশ লাগছে।"

"আর দুটো দিক—"

"আজ্ঞে, এখনও অনেক রয়েছে, দিতে হবেনা। লাগলে আমি চেয়ে নেব।" দীপঙ্কর নীরবে আহার করিতেছিল জামাইদের পাশে জামাই সাজিয়া। হঠাৎ বলিয়া বসিল, "পোলাউর চাল পাওয়া যাচ্ছিলনা, আমায় বলেননি কেন, মা? আমি পাঁচমনী কয়েকটা বস্তা ঘরে কিনে রেখেছি অসময়ে পাবনা বলে। একটা পাঠিয়ে দিতাম।"

বড় জামাই হাস্য গোপন করিলেন, মেজ অধিকতর বিষণ্ণ হইলেন। ছোট দীপঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওঃ, আপনি তো আচ্ছা কাজের লোক!"

দীপঙ্কর আত্মপ্রসন্ন হাস্যে বলিতে লাগিল, "I am in the habit of storing up things —আমার বাড়ীতে তিনটে ঘর ভর্তি জিনিষপত্র সাজানো। যখন যা' দরকার, ঘরে ঢুকলেই পাওয়া যায়।"

পাশের ঘরে বসিয়া শ্রীলতা ও ভগ্নিবৃন্দ খোলা দরজার পথে নিমন্ত্রিতদের আহারাদি পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। শ্রীলতা বিরক্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই সম্প্রীতি তাহার নীলাম্বরীর অঞ্চল টানিয়া বলিল, "উঠে যাবার মুখ তোমার আছে? চাল নেই, সাড়ে সাত টাকা দামের ঘি বড়-বৌদি যথেষ্ট পরিমাণে দিতে দিলেননা। অত কম ঘিতে পোলাউ হয়? তাইতো বড় জামাইবাবু ঠেলে রাখলেন, মেজ খেলেননা,

ছোট অতি আগ্রহ দেখিয়ে আরও জব্দ করলেন। দীপঙ্করদা'র ব্যবহার এর চেয়ে খারাপ কি হ'ল শুনি?"

বিনতা ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল, "এ-ছাই পোলাউ করা হ'ল কেন?"

সম্প্রীতি জবাব দিল, "রায়-বাড়ীতে পোলাউহীন জামাইষষ্ঠী! কি বলছিস্, বিনি?"

মালতী চোখ বড় করিয়া কহিল, "এর চেয়ে দীপঙ্করদা'র কাছ থেকে পেশোয়ারী চাল চেয়ে নিলেই হত।"

সম্পা গান ধরিল চাপা গলায় ঃ—

"Too proud to beg,
Too honest to steal,
And so I belong to the shabby genteel."

পোলাউর ইতিবৃত্তের পর বিশেষ স্মরণীয় কিছুই ঘটিল না। মৎস্যের অপ্রতুলতা ও সন্দেশের গরীবিয়ানা আকৃতি দেখিয়া বড়-মেজ যুগপৎ বিরক্ত ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন। গুড় দিয়া রান্না আনারসের চাটনী ও তেলে ভাজা চপ্ তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল অবশ্য নিঃসন্দেহে।

গৃহিণী বারে বারে বিপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, "টাকা দিয়েও কিছু মেলানো যায়না। যা দিন কাল পড়েছে! তোমাদের খাওয়ার বড় কষ্ট হল।" তাঁহার ভাঁড়ার যে একমাসের মত শূন্য হইয়া গেল, এই এক মাস যে কত অনটনে প্রাত্যহিক আহার-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, সে চিন্তাও তাঁহার খেদ প্রকাশের ভাষাকে কিঞ্চিৎ জোরাল করিয়া তুলিল। বড়-মেজ বিশেষ কিছু খাইলেননা, সেজ মুখে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইলেও কার্যতঃ বড়-মেজ'র পন্থাই অনুসরণ করিলেন। একমাত্র নির্লজ্জভাবে আকণ্ঠ ভোজন করিল দীপঙ্কর একা, বারে বারে চাহিয়া লইয়া,— "আর একটু ইলিশের পাতুরী দিন, মা। হোটেলের খাওয়া-মুখে যেন অমৃত লাগছে! আর একহাতা পোলাউ, বৌদি। আহা, এত যত্ন করে রেঁধে খাবার দেবার লোক আমার কেউ নেই। চাকর বাকরে কি মন ভরে! এ পাড়ার দই বড় ভাল। বিলিতী খানায় দই থাকেনা। একটু দই দিতে বলুন।"

জয়া বিপন্ন ভাবে শাশুড়ীর দিকে চাহিল। জামাইষষ্ঠীর দিনে সাড়ে চার টাকা সেরের দই যতটুকু আনা হইয়াছিল, কয়েকটি বাটীতে সাজাইয়া দিতেই ফুরাইয়া গিয়াছে। দোকানও বেশ দূরে।

দীপঙ্কর চকিতে জয়ার মুখ লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে দই সামনেই আছে। বড়-জামাইদা দই খাবেননা বলে সরিয়ে রেখেছেন। ওটি আমারি ভোগে লাগুক। দিন দাদা, দিন সরিয়ে। হাঃ হাঃ।"

বড় জামাই দই সরাইয়া দিয়া বিদ্রূপ-কণ্ঠে বলিলেন, "সাহেবী খানায় দই না থাকলেও সাহেবী পাড়াতে তো দই-এর দোকান থাকে বলেই জানতাম।"

দীপঙ্করের বন্ধু, বাড়ীর তৃতীয় ছেলে অমিয়েন্দ্রের কান লাল হইয়া উঠিল। দীপঙ্কর কিন্তু সহজভাবেই বলিল, "আর দাদা, কার দই কে খায়? যত দই যায় আমার কুকুরের পেটে। রোজ সকাল বেলা তাঁর বরাদ্দ খাবার কে, সি, দাসের দোকানের আধসের দই, দুটো বড় সন্দেশ।"

শ্রীলতা অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "অসহ্য!"

আহারাদির পর সকলে বসিবার ঘরে সমবেত হইলেন। দীপঙ্কর বারইঞ্চি লম্বা সোণার সিগারেট কেশটি সকলের সম্মুখে ধরিতে লাগিল মধ্যস্থিত সিগারেটের মহার্ঘতা সম্পর্কে সকলকে সজাগ করিয়া। সেজ জামাই ঠাট্টা করিলেন, "কেশটি তো বেশ। উপহার না কি?"

"কে দেবে উপহার? নিজেই গড়িয়েছি। পাথর বসিয়ে তৈরী করতে পাঁচশো মত টাকা লেগেছে। সেই সঙ্গে কোমরের চামড়ার বেল্টের বক্‌লস্‌টাও, নইলে বড্ড হারিয়ে যায়। বক্‌লস্‌টায় চার ভরি সোণা আছে?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "বেল্‌ট্‌টা সোণার গড়ালে কেন? ও যে বড় চোখে লাগে। হোয়াইট-গোল্ড হ'লেই ভাল হ'ত।"

সেজ জামাই মন্তব্য কাটিলেন, "লোকে যদি নিকেল বলে ভুল করে, সে ভয় তো দীপঙ্করবাবুর আছে।"

"তা দাদা, আমার সোণা থাকলে লোকে নিকেল ভাবলে কি কোন সুখ হবে আমার? তেমনি নিকেলে সোণার প্লেট পরালেও অস্বস্তি পাব, কি বলুন? আহা, কি যে লাইনটা? লেখাপড়া বেশীদূর করবার সুযোগ পাইনি; কিছু মনে রাখতে পারিনে। সেই যে—"All that glisters is not gold."

মেজ জামাই মুখ কাল করিয়া সম্পূর্ণ দিনের মত বিষণ্ণতার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে এক ঘণ্টার ছুটি চাহিয়া দীপঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেল, চা খাইতে ফিরিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া। তাহার নাকি বিশেষ কাজ আছে।

দীপঙ্করের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বড় জামাই শ্রীলতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "Congratulations, Miss Hoity-toity."

"একে জোটালে কোথা থেকে, অমিয়? তোমার বন্ধু শুনলাম না?" মেজ এতক্ষণে প্রশ্ন করিলেন।

"আমার স্ত্রীর মুখে শুনলাম, শ্রীলতার পাণিপ্রার্থী। কথাবার্তা, ধরণ-ধারণ তো আমার বিশেষ ভাল লাগল না। অবশ্য আমার ভুল হ'তে পারে।" সেজ-জামাই মত দিলেন।

সম্প্রতি সব কথার উত্তর দিল, "হ্যাঁ বড়-জামাইদা, হয়ে গেলে সত্যিই দিদিকে অভিনন্দন আমাদের করা উচিত। দীপঙ্করদা'র টাকা গোণার বাইরে। মেজ-জামাইদা', সেজদা' দীপঙ্করকে জোটায়নি। উনিই সেজদা'কে এতদিন পরে জুটিয়েছেন। উনি বাল্যবন্ধু। সেজ-জামাইদা', দীপঙ্করবাবুই তো আপনার কথার উত্তর দিয়ে গেছেন।– "All that glisters is not gold."

স্বতঃপ্রবৃত্তা সম্প্রীতির কাটা-কাটা বাক্যবাণে কর্তিত হইয়া তিন জামাই নিরস্ত হইলেন। দ্বিতীয় রায়-ভ্রাতা চপলেন্দ্র জামাইদের মান-রক্ষা করিতে ভগিনীকে ধমক দিলেন—"সম্পা, তুমি চুপ করো। তোমাকে তো কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেননি।"

অপ্রীতিকর পরিবেশের উপর যবনিকা টানিবার চেষ্টায় অমিয় বলিতে লাগিল, "খুব আশ্চর্য জীবন কিন্তু লোকটির। ছোট থেকে বড় হবার চেষ্টায় লেখা-পড়া বা আচার-ব্যবহার কিছু শিখে উঠতে পারেননি। আপনাদের পাশে তো বেমানান লাগবেই। কিন্তু, লোক বড় ভাল। ওযে কি ভাবে উঠেছে বলি, শুনুন, ঠিক একটা গল্প। এ গল্প কিন্তু আপনাদের সবাইকার জানা আছে অন্যরূপে। শুনুন।"

"Turn again Whittington."

অভিমানী বালক ডিক হুইটিংটন বহুদিন পূর্বে দারিদ্র-যাতনায় নিপীড়িত হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল—বিদেশী কাহিনী বলে।

সন্ধ্যাকালে গির্জার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ঃ—

"Turn again, Whittington.
Lord mayor of London."

সে ফিরিল। আত্মহত্যার পথ হইতে সুমধুর ভবিষ্যৎবাণী তাহাকে ফিরাইল। যে দেশে বিড়াল নাই, সেই দেশে নিজের পালিত বিড়ালের দ্বারা ইঁদুরের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া সে স্বনামধন্য পুরুষরূপে পরিগণিত হইল। অবশেষে লণ্ডন

শহরের লর্ড মেয়র রূপে সেই দীন-দরিদ্র বালককে দেখা গেল। বিদেশী ইতিবৃত্ত ইহাই বলে। দীপংকর বিংশ শতাব্দীতে বাংলার সেই লর্ড মেয়র।

গল্প শেষ হইলে বড় জামাই সবিদ্রূপে বলিলেন, "তা, নামটি মেলেনা। কিন্তু designation-টি বড় চমৎকার খাটে—লর্ড মেয়র।"

মেজ সায় দিলেন, "ঠিক কথা। এবার থেকে ওকে লর্ড মেয়র বলে ডাকলেই হবে।"

সেজ বিনীত হাস্য করিলেন,—"আপনাদের খুব মাথা! হাঃ হাঃ, লর্ড মেয়র!"

অমিয়েন্দ্রের মুখের অবস্থা দেখিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "তা লর্ড মেয়র নামটা মন্দ কি? দীপংকরের সংগে মেলে। টাকা তো ও অমনি করেই করেছে। ধরণ-ধারণও লর্ড মেয়রের মতই। জাঁকজমক ভালবাসে, অথচ মনের ঔদার্য আছে।"

চপলেন্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "লর্ড মেয়র বলে ডাকলে দীপংকর খুসী হবে বলে আমার বিশ্বাস।"

দরজায় দীপংকরের উজ্জ্বল বিশাল গাড়ী আসিল। শ্রীলতা সম্প্রীতি পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল। মালতী-বিনতা একসংগে বলিয়া উঠিল, "লর্ড মেয়র এসেছেন।"

দীপংকর এধারে না আসিয়া সোজা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। তাহার হাতে কয়েকটি সাদা কাগজের বাক্স। দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা।"

গৃহিনীর বড় নাতি অগ্রসর হইয়া বলিল, "এসো, দীপংকরদা। দিদি তোমাকে ওপরে ডাকছেন।"

রায়-বাড়ীর প্রাচীন মার্বেলে বিলাতী জুতার শব্দ তুলিয়া দীপংকর রায়-গৃহিণীর দরজায় দাঁড়াইল। "ভেতরে যাবনা, মা। একটা কাজ করে ফেলেছি। বকতে পারবেন না, কিন্তু।"

স্নেহ-সিক্ত স্বরে গৃহিণী বলিলেন, "বলো, বাবা।"

"ফিরপো'তে এক সাহেবের সংগে দেখা করতে হয়েছিল। ওরা নূতন ধরণের কেক এনেছে। সাহেব ক'বাক্স নিলেন, আমাকেও বল্লেন নিতে। লোভ সামলাতে পারলাম না। ভাবলাম একা খাব কেন? এখানে তো আসছিই। সংগে আনলে সবাই মিলে খাব।"

গৃহিনী ঈষৎ বিরক্তির সংগে বলিলেন, "আজ তুমি আমার নিমন্ত্রিত"—দীপংকর চকিতে গৃহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নীচু স্বরে উত্তর দিল, "আমি আপনার ঘরের ছেলে। আর কতদিন পর ক'রে রাখবেন, মা?"

গৃহিনী ঘরের প্রান্তে মেহগিনীর পর্যংকে শায়িত স্থবির কর্তার দিকে চাহিলেন। জামাই ষষ্ঠির দিনে দীপংকরের মুখে এমন প্রস্তাব তিনি আশা করিতেছিলেন, বিস্মিত হইলেন না। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "আমার তো বড় ইচ্ছা, বাবা, তোমাকে আপন করে নিই।"

"জীবনে আমারও সেই এখন একমাত্র ইচ্ছা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাকে 'মা' বলে ডাকার অধিকার পাওয়া।"

গৃহিনী নিরুত্তর কর্তার দিকে পুনরায় চাহিয়া বিব্রত ভাবে বলিলেন, "কোন বাধাই নেই। আচ্ছা পরে এসব কথা বলব। শ্রীলতা, কেক নিয়ে সবাইকে চায়ের সংগে দাও।"

শ্রীলতা আসিল না, আসিল সম্প্রীতি। শ্রীলতার নাম শুনিয়া দীপংকর একাগ্র দৃষ্টিতে দোতালার চাতালের শেষে একটি নীল পরদাবৃতা ঘরের দরজার দিকে চাহিয়াছিল। ওই ঘরে দীপংকরের জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন কুমারী শ্রীলতা রায় থাকে। সেই শ্রীলতা, দীপংকরের কোটি মুদ্রাও যাহাকে কিনিতে পারিতেছেনা। ওই গৃহে প্রবেশের অধিকার হয় নাই দীপংকরের। একবার ওই গৃহে প্রবেশ-লাভের পরিবর্তে দীপংকর মনে মনে বহু ভারী কণ্ট্রাক্টও ছাড়িয়াছে।

সম্প্রীতিকে দেখিয়া নিরাশ দীপংকর আত্মসম্বরণ করিয়া মেজেতে নামানো 'ফিরপো' লেখা কাগজের ছয়টি বাক্স দেখাইল, "মেম সাহেব, ভেট নাও।"

সম্পা হাসিমুখে বলিল, "বাঃ, অনেক ধন্যবাদ, দীপংকরদা।"

শ্রীলতার সম্মুখে বাক্স নামাইয়া সম্প্রীতি বলিল, "নাঃ, দীপংকরদার নজর আছে। প্লাম্-কেক, পুডিং, পেষ্ট্রী, সমস্ত এনেছেন। আর কত পরিমাণে!"

"ফেলে দে—"

"কেন? বেশ সুন্দর জিনিস তো।"

ক্ষুব্ধা সর্পীর আক্রোশে শ্রীলতা বলিল, "খাবারের অবস্থা দেখে আমাদের সাহায্য করতে এসেছে।"

"তা দিদি, এনে ভালই করেছেন। তোমার সম্বল তো বিকেলের জলখাবার র‍্যাশনের তেঁতুল-বীচি মেশানো আটার নিমকী, আর বড়ি-বড়ি সন্দেশ, বড় জোর কলা, আমের কুচি। দীপঙ্করদা এ দিনে মান রক্ষে ক'রেছেন। জামাই দাদারা এবারে অবজ্ঞা দেখাতে সাহস পাবেন না। একবেলার চায়ে এত খরচ তাঁদের ক্ষমতায় কুলোবেনা।"

"তাঁরা কোনদিন এইভাবে খাবার কিনে নেমন্তন্ন বাড়ীতে দিতে আসতে পারতেন না।"

সম্পা দুঃখের হাসি হাসিল,—"সে কথা সত্যি। এ প্রথাটা সম্পূর্ণ বিদেশী। অবশ্য এ বাড়ীতে খাবার কিনে আনবার কথা কখনও তাঁদের মনে হত না, কারণ তাঁরা তাঁদের সহধর্মিনীর বাড়ী পরের বাড়ী বলেই, নেমন্তন্ন বাড়ী বলেই মনে করেন। কিন্তু, ছোট ছেলে-পিলেদের হাতেও কিছু দিয়ে ভালবাসা দেখাবার... প্রবৃত্তি হয় না তাঁদের। দিদি, ভুল কোরনা।"

শ্রীলতার কুঞ্চিত কেশ গ্রীবাসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে সাপের ফণার মত নাচিয়া উঠিল, "তার মানে?"

"তার মানে, তোমার গৌরব মনে মনে তুমি হারিয়েছ। দীপঙ্কর লাহিড়ীকে তুমি ছোট ভাব না, অনেক বড় ভাব। শুধু তাঁর তোমার চেয়ে বেশী টাকা আছে বলে। সে কথা ভুলতে পারছ না। ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স গ্রাস করেছে তোমাকে। তাই এত সুপিরিয়রিটি আসছে তোমার। ভালবাসাকে দম্ভ প্রকাশ ব'লে ভুল করছ।"

চার

পাঁচ বছরের পুরাতন কাল কোর্ট-শু হইতে রক্ত কোকনদের মত কমনীয়, রক্তাভ পদপল্লব বাহির করিয়া এক মুহূর্তের জন্য শ্রীলতা কোমল গালিচার বক্ষে স্থাপন করিল। কতদিন এমন একখানি গালিচা সে চোখে দেখে নাই। অঙ্গুলী-গুলি শ্রীলতা একবার বাঁকাইল। সোয়েড্ বলিয়া অতিযত্নে রাখিয়া এখনও পরা চলিতেছে। তবু, শক্ত কোণাগুলি পীড়া দেয়। বাহুর উপর হইতে কাল শিফন সরাইয়া ছোট মনির মত ঘড়ির দিকে শ্রীলতা লক্ষ্য করিল। রাত্রি সাড়ে সাত।

দীপঙ্কর সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে শ্রীলতার প্রতিটি ভঙ্গি দেখিতেছিল।

বাদাম আকারের গোলাপী নখ হইতে কানের পাশের সুসজ্জিত কাকপক্ষকৃষ্ণ চুলের স্তবক,—শ্রীলতার সব কিছু তাহার বড় পরিচিত, তাহার কাছে অত্যন্ত

মূল্যবান। দেবীর পদ-নখ-কণা স্পর্শ সে এখনও করিতে পারে নাই। তাই সমগ্র ইন্দ্রিয় তাহার দৃষ্টির মধ্য দিয়াই তৃপ্ত হইতে চায়।

শ্রীলতা! দীপঙ্করের জীবনের সমস্ত আয়োজন অজ্ঞাতসারেই এই পরিণতির জন্য পথ চাহিয়াছিল। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রতিমুহূর্তে মাথা তুলিবার চেষ্টা, প্রতি মুহূর্তে সুন্দরভাবে বাঁচিয়া থাকিবার প্রচেষ্টা কেন? একদিন শ্রীলতা রায়ের মত কেহ আসিবে, কাহারও সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার জীবনব্যাপী সংগ্রাম মূল্য পাইবে।

অন্ধের মত দীপঙ্কর অর্থ উপার্জন করিয়া যাইতেছে। তাহার বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই, শান্তি নাই। এই অর্থ যে কোন ব্যক্তির একার পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত। অর্থে তাহার মমতা নাই, তবু অর্থে তাহার আসক্তি।

দীপঙ্করের সাহেবী খানা শেষ হইয়াছে। নিমন্ত্রিত রায়-পরিবার উপবেশন করিয়াছেন দীপঙ্করের ড্রইং-রুমে। রাস্তায় রায়-বাড়ীর জীর্ণ গাড়ী ও দীপঙ্করের চারখানা নূতন গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে।

দীপঙ্করের দৃষ্টি সূচীর মত শ্রীলতাকে পীড়া দিতে লাগিল। যেন তাহার সমস্ত সম্ভ্রম, সমস্ত শালীনতা ভেদ করিয়া তাহার গর্ব, তাহার ঔদাসীন্যকে পরাস্ত করিয়া এই প্রখর পৌরুষ-দৃষ্টি বলিতে চায়, "বাহিরের আবরণ খুলিয়া ফেল, শ্রীলতা রায়। আমার বাহিরে তোমার বাহিরে প্রভেদ থাকিলেও উভয়েই রক্তমাংসের মানুষ। তোমার বাহ্যিক পালিশ গ্রহণ করিবার সুযোগ হইয়াছে, আমার হয় নাই। তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি জানি তুমি কি চাও। তুমিও জানিতে শেখ আমি কি চাই।"

শ্রীলতা ইতস্ততঃ নড়িয়া বসিল। ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়া ঈষৎ রঙ্গীন আলো শ্রীলতার অনুপম লাবণ্যকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে একটি মর্মর-বিরচিত নারীমূর্তি। তাহার সম্মুখে মর্মরের ত্রিপদীতে রক্ষিত লাল গোলাপ-গুচ্ছ। আগে-পিছে মর্মর বন্ধনীতে ওই গোলাপের মতই স্বাভাবিক সৌন্দর্য সে বিকীর্ণ করিতেছে। পাথর ভাঙ্গিয়া তাহাকে পাইতে হয়।

দীপঙ্করের দৃষ্টিসূচীতে বিদ্ধ হইয়া বারে বারে শ্রীলতা বসিবার ভঙ্গি পরিবর্তন করিতে লাগিল। কিন্তু দীপঙ্করের নির্মম দৃষ্টি একবারও তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। যদিও অন্য অতিথিরাও সজাগ সমাদরে বঞ্চিত হইলেন না।

শ্রীলতা বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চন করিয়া অবশেষে সোজাসুজি দীপঙ্করের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ উভয় দৃষ্টি আলিঙ্গনের নিবিড়তায় লগ্ন হইয়া রহিল।

দীপংকরের দৃষ্টিতে একাগ্রতার সহিত বিবাদ। নিজের সাহেবী ফ্যাসানে বর্দ্ধিত নখরসম্বলিত অংগুলির দিকে একটুক্ষণ দৃষ্টি নামাইয়া দীপঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।......তাহার পরেই ক্লান্ত যোদ্ধার কর্তব্য-পরায়ণতায় আত্ম-সংবরণ করিয়া মহেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "সাউথ আফ্রিকা ঘুরবার সময়ে কিছু কিউরো সংগ্রহ করেছিলাম। অবশ্য তাতে কয়েকটি হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে আমার। দেখবেন দাদা?"

শ্রীলতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল...এ দীপঙ্কর তাহার পরিচিত। নিজের অর্থ ও সামর্থের বর্ণনামুখর, বহুভাষী, অতিসাধারণ ঠিকাদার দীপঙ্কর লাহিড়ীকে বাংলার শ্রেষ্ঠতম অভিজাত পরিবারের কন্যা শ্রীলতা রায় চেনে। কিন্তু, মৌন প্রেমিক শ্রীলতার অপরিচিত। সেই রূপ শ্রীলতাকে অস্বস্তিই দেয়। আপাত-দৃষ্টির অগোচর অজানার অস্তিত্বে জাগরূক করিয়া তোলে।

বেয়ারা একগোছা চাবি আনিয়া দিল। একপাশে একটি মেহগিনির কেবিনেট ছিল। দীপঙ্কর পাল্লা খুলিল। মহেন্দ্র, অমিয়েন্দ্র, চপলেন্দ্র, তিন বৌ সেদিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। দীপঙ্কর নানাবিধ দ্রব্য দেখাইতে লাগিল।

মাঝে মাঝে তাঁহাদের উচ্ছ্বাসও শোনা যাইতে লাগিল। শ্রীলতা ধীরে ধীরে উঠিয়া রাস্তার দিকের জানালার কাছে দাঁড়াইল। ত্রিতলের জানালা। সে লাল মখমলের পর্দা সরাইয়া নীচের পীচের রাস্তার প্রতি চাহিয়া রহিল। লঘু বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্প্রীতি, মালতী ও বিনতা নিমন্ত্রিত হইয়াছে। পাশের ঘরে তাহারা অটোম্যাটিক গ্রামোফোনে ইংরাজী রেকর্ড শুনিতেছে ও সুশীতল কমলার রস পান করিতেছে। সুদীর্ঘ ঘরের এক প্রান্তে শ্রীলতা। পাশের ঘরে সংগীত বৃষ্টির তালে তালে ভাসিয়া আসিতে লাগিল ঃ—

"Like the beat, beat, beat of the tom tom
When the jungle shadows fall,
Like the tick, tick tock of the stately clock
As it stands against the wall—"

"শ্রীলতা!" শ্রীলতা চমকিয়া উঠিল, দ্রুত ঘরের অপর প্রান্তে চাহিয়া দেখিল দাদা-বৌদিরা মহানন্দে অ্যালবাম দেখিতেছেন। পশ্চাতে চাহিবার প্রয়োজন হইলনা শ্রীলতার। হাভানা, পোমাড্ ও ফরাসী এসেন্সের সৌরভ বলিয়া দিল, কে আসিয়া শ্রীলতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে।

"শ্রীলতা, আমার কোন কিছুতেই তোমার মন নেই কেন? ওইসব জিনিষ সংগ্রহ করতে যেয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। আমার কোন মূল্য তোমার কাছে নেই কেন?"

"—Like the drip, drip, drip of the rain-drops
When the summer shower is through,
So a voice within me keeps repeating
You, you, you...
Night and day..."

"চুপ করুন।"

"অনেকদিন করেছি। আজ তোমাকে শুনতেই হ'বে। আমি ক্লান্ত, শ্রীলতা। ভাল করে কথা বলতে শিখিনি, শ্রীলতা। উত্তর দাও।"

বৃষ্টির মাদকতায় বিদেশী প্রণয়-সংগীত ঃ—

"So a voice within me keeps repeating
You, you, you...
Night and day."

শ্রীলতার সর্পী-নয়নে স্বপ্ন নামিয়া আসিল। দীপংকরের ক্লান্তি শ্রীলতার প্রাত্যহিক দিন-যাত্রার অপ্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিবার ক্লান্তিকে স্পর্শ করিল। উভয়েই ক্লান্ত। উভয়েই জীবনের উপকরণ সংগ্রহে ক্লান্ত। উভয়েই সংগ্রামশীল। আর কেন?

শ্রীলতার মন গুঞ্জন করিয়া বলিল ঃ—

'আর কেন? সমস্ত ঐশ্বর্য তো তোমারি পদপ্রান্তে, শ্রীলতা। তিলে তিলে সংগ্রহ করিয়া জীবন-ভাণ্ড ভরা চলে হয়তো কাব্যিক প্রথায়। কিন্তু, প্রতিদিনের ভদ্র জীবন-যাপনের আনুসংগিক ওইভাবে সংগ্রহ করায় বড় ক্লান্তি। বড় ক্লান্তি, শ্রীলতা। এই পোষাক সাত বছরের পুরাতন, কাল শিফনের শাড়ী, কাল স্যাটিনের জামা। খোলার সংগে নিজ হাতে ইস্ত্রি করিয়া কর্পূরের চাকি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সযত্নে তুলিয়া রাখিতে হইবে। তোমার যে বেশী নাই। অথচ এইরূপ পোষাক সকলে তোমার অংগে আশা করে। ওই কাল-জুতা অতি সন্তর্পণে ব্যবহার করিতে হয়। অনেক কিছুই করিতে হয়, শ্রীলতা, যাহা তোমার নিকট দীনতা-হীনতায় পরিপূর্ণ। একটি কথা বলার অপেক্ষা মাত্র। সৌন্দর্যের পশ্চাৎধাবনে ক্লান্ত দীপংকর। যাহা সে চায়, সেই সৌন্দর্য পাইবার ক্ষমতা তাহার একার নাই। শুধু পরিবর্তে অর্থ উপার্জনের নেশা ঘুচিতেছে না। একটির পর একটি কণ্ট্রাক্টের সে পশ্চাৎধাবন করিতেছে, যদিও সেই অর্থে তাহার প্রয়োজন বা প্রেম কোনটাই নাই।

তোমার সংস্কৃতি দিয়া তাহাকে স্পর্শ কর, শ্রীলতা। তাহার ঐশ্বর্য তোমার পটভূমি রচনা করুক।'

শ্রীলতা হস্ত-প্রসারণ করিল নিজের অজ্ঞাতসারে—চায়—সে চায়। দীপঙ্করের বিরাট বসত-বাড়ী, আটখানা ভাড়া-বাড়ী, চারখানা মোটর, একটি প্লেন, দার্জিলিং—পুরী—কাশ্মীর—দিল্লীর বিভিন্ন সুসজ্জিত আবাস, সুন্দরবনের জমিদারী, আসানসোলের খনি, সিন্দুকের সঞ্চিত দুর্লভ রত্নালঙ্কার, ব্যাঙ্কের টাকা,—সমস্ত সে তাহার ছোট দুইটি কর-গ্রাসের মধ্যে চায়। দাও, তাহাকে দাও। আর সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না।

দাদা-বৌদিরা ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। শ্রীলতার প্রসারিত হস্ত নিজের উত্তপ্তহস্তে গ্রহণ করিয়া দীপঙ্কর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "এই হাতে আমার ইহকাল, পরকাল সমস্তই তুলে দিয়েছি। একটি আংটী পরাতে দাও।"

—অতি বৃহৎ মরকত, বৃহৎ হীরকখণ্ডের দ্বারা বেষ্টিত অঙ্গুরীতে জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীলতার ক্ষীণ চাঁপার কলি অনামিকাকে গ্রাস করিয়া রাহুর মত হিংস্র আক্রোশে জ্বলিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালায় শ্রীলতা সেই আংটি দ্রুত খুলিয়া ফেলিল। দীপঙ্করের আত্ম-বিশ্বাস তাহার দারিদ্র্যকে অপমান মাত্র। শ্রীলতা রায়ের সম্মতিতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না বলিয়াই এই আংটি দীপঙ্করের পকেটে ফিরিতেছে। আংটির অতি বৃহৎ রত্নগুলি শালীন রুচির বিরুদ্ধে দীপঙ্করের স্পর্দ্ধার মত। শ্রীলতা রায়ের জীবন এই অঙ্গুরীয়ের পাকে অগ্নির মতই জ্বালা দিবে।

দীপঙ্করের অনিচ্ছুক হাতে আংটিটি ফিরিয়া গেল। বিমূঢ়ভাবে সে প্রশ্ন করিল, "এর মানে?" মুহূর্তপূর্বের আত্মবিশ্বাসী প্রেমিক তিরস্কৃত অপরাধী বালকের মত অপ্রস্তুত ভীরুতায় জমিদারতনয়া শ্রীলতা রায়ের সম্মুখে সহসা নিজেকে বড় ছোট মনে করিতে লাগিল। চারতলা রায়-বাড়ীর সম্মুখে দণ্ডায়মান কেরাণীর ছেলে দীপঙ্করের অতীত আবার ফিরিয়া আসিল।

"দামী জিনিস তুলে রাখুন। যথাযোগ্য স্থানে দিয়ে দেবেন।"

কালসর্পীর মসৃণ গতিশীলতায় শ্রীলতা দরজার পরদা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল পাশের ঘরে।

একা ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান দীপঙ্করের চোখের সম্মুখে বিষধরী মনোহারিণী সর্পী চলিয়া গেল। কিন্তু, তাহার দংশনের সমস্ত জ্বালা ঢালিয়া গেল দীপঙ্করের বুকে।

পাঁচ

হ্যাঁ, শ্রীলতা রায় আজ ট্রামে। শ্রীলতা, যে পুরুষের পৌরুষ দৃষ্টির মুগ্ধতাতে পর্যন্ত অবমাননা বোধ করিত, সেই অভিজাততনয়া, শ্রীলতা রায় আজ পরপুরুষের গায়ে গা লাগাইয়া সাধারণী যানে চলিতেছে। না, অনেক ধনীতনয়ার ন্যায় সখ করিয়া অথবা বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া শ্রীলতা উল কিম্বা সিল্ক মার্কেটিংএ ট্রামে চড়িতেছে না। সাড়ে নয়টা বেলা সে কারণে উপযোগী নয়।

শ্রীলতা সাপ্লাইতে দেড়শো টাকার কেরাণীগিরি পাইয়াছে, বড় বৌদির ভাইএর সাহায্যে বাড়ীর তীব্র প্রতিবাদের বিরুদ্ধে। দীপংকরকে প্রত্যাখ্যান করিবার পরে অহরহ বাক্যবাণে বিদ্ধা শ্রীলতা সহজ পথ কঠিন প্রয়াসে বাছিয়া লইয়াছে। অভ্যস্ত হইতেছে না চাকুরি, তবুও প্রয়াসে ত্রুটি নাই।

শ্রীলতা রায়ের অফিসে পরদা ঢাকা একটু স্থান মিলিয়াছে সত্য, কিন্তু আবরু বিশেষ মেলে নাই। একপাশে দেয়াল, একপাশে দরজা, পিছনে জানালা। সামান্য দুই তিন হাত জায়গার মধ্যে একটি ছোট কাঠের টেবিল, হাতলহীন শক্ত চেয়ার এবং কাঠের শেলফ্‌। ফাইল আছে, ট্রেতে দোয়াত-কালী, পেন্সিল, আঠা, আলপিন ও কাগজ-চাপা। তন্বী-সুন্দরী, অভিজাত-তনয়া, বিখ্যাত রায়বংশের উপযুক্ত দুহিতা শ্রীলতা আজ অফিসে কেরাণী; ডলি বোস, রেখা সেন, লীলা মিত্তির প্রমুখ অসংখ্য অখ্যাতনামার মত। শ্রীলতা রায়েরও চম্পক-অংগুলি কালির দাগে কলঙ্কিত হইয়া যায়, শ্রীলতার সর্পী-নয়ন হিসাব-নিকাশ পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হয়। যাতায়াতে সাধারণ পুরুষের লুব্ধ-অভদ্র চাহনী তাহাকে গ্রাস করে, কদর্য মন্তব্য কানে প্রবেশ করে। পরদা-ঢাকা আশ্রয়ে শ্রীলতার অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। বাহিরে প্রাণপণে সে মুখের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখিয়া যান্ত্রিক একাগ্রতায় অফিস-যন্ত্রের একটি অংশে পরিগণিত হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্ক্রু-শূন্য অংশের অসংলগ্নতায় শ্রীলতা রায় বারবার বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। একঘেয়ে যন্ত্রে পরিগণিত হওয়া শ্রীলতার সাধ্যায়ত্ত নাই। সারাজীবন যার সৌন্দর্য ও বিলাসের ছায়াতলে কাটিয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বর্ণরাগ হারাইয়া সহসা ধূসর বর্ণহীনতায় সামঞ্জস্য-বিধান সম্ভব নহে। খিট-খিটে উপরওয়ালা বিবাহিত, বয়স্ক, ধার্মিক; তাই রক্ষা। শ্রীলতার অচঞ্চল যৌবনে তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শ্রীলতার কর্মে তাহার প্রয়োজন। বঙ্কিম ভুরুর নিম্নে খঞ্জন-গঞ্জন্‌ দুইটী চক্ষুতে কেমন করিয়া অসহায় লজ্জা নামিয়া আসে, দেখিবার সময় শুষ্কশীর্ণ অফিসারের নাই। তবে হিসাব-খাতার ভুল দেখিবার

অনুসন্ধিৎসা প্রবল। সেই তাহার উচ্চাসনে বসিবার একমাত্র যোগ্যতা। চম্পক-অঙ্গুলি বলিতে কবিরা কি বুঝাইতেন, চোখের সম্মুখে থাকিলেও চোখ মেলিয়া দেখিয়া পুরুষ-জন্ম সার্থক করিবার প্রচেষ্টা আদৌ তাহার দেখা যায়না। কিন্তু, সেই চম্পকাঙ্গুলির একটি লেখার ভুলও চোখ এড়ায় না। যান্ত্রিক একাগ্রতা অভিজাত-তনয়া শ্রীলতা কোথায় পাইবে? সুতরাং তিন মাসের মধ্যেই শ্রীলতার কর্মজীবন কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

আজও বিষণ্নমুখে শ্রীলতা চিঠি-পত্র নাড়াচাড়া করিতেছিল বিফল প্রয়াসে। গত দুইদিন হইল সে শিরঃপীড়াতে কষ্ট পাইতেছে। কর্মজীবনে অবকাশের চিন্তা অসংগত। তবে পূর্বে হইলে, এতক্ষণ ঘরের জানালায় শাড়ী-কাটা পর্দা টানিয়া মাথায় গোলাপ-জল অভাবে সাদা জলপটী লাগাইয়া শুইয়া থাক চলিত যতক্ষণ ইচ্ছা। কেহ তাহাকে ডাকিতনা। কিন্তু, এখন একটি দিনও শ্রীলতা বাড়ীতে শুইয়া বিশ্রাম লইতে সাহস পায়না। গৃহের অশান্তি এড়াইতে সে দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছে। গৃহের অশান্তির মধ্যেও যে স্বাধীনতা আছে, একথা আবিষ্কার করিল শ্রীলতা।

যন্ত্রণায় মাথার মধ্যে অস্থির লাগে—হিসাবপত্রের হিজিবিজি মাথায় ঢোকেনা। শ্রীলতা হাতের উপর মাথা নামাইয়া বসিয়া রহিল। মেয়েদের স্বাধীনতা কোথায়? গৃহে নাই, বিবাহে নাই, স্বাধীন কর্মজীবনেও যে নাই, তাহাও সে দেখিয়া হইল। বাড়ীতে নিজের ইচ্ছামত জীবন-যাপন করিতে পারে নাই শ্রীলতা। সেই শ্বাসরোধকারী বায়ুস্তর হইতে মুক্তিলাভের জন্য এ কোথায় সে আসিল? From frying pan into the fire.

না, আজ শ্রীলতা রায় সহ্য করিবেনা। মানুষ সে, রোগে মানুষের দাসত্ব হইতে মুক্তি আছে। এ অফিসে আইন গাঁথিয়া কেহ ইহা লিখিয়া না দিলেও মানিতে হইবে। বড়-সাহেবের জামাই শ্বশুরালয়ে আসিলে তিনি অর্ধঘণ্টা হাজিরা দিয়া জামাতার সম্বর্দ্ধনার্থে বাড়ী প্রস্থান করেন। অন্যান্য অফিসারেরা যথাইচ্ছা সময়ে একবার পাদস্খলন করিয়া যান। প্রায়ই খবর লইলে শোনা যায়, তাঁহারা বাহিরে কাজ করিতেছেন। প্রিয়পাত্রেরা অফিসটিকে আড্ডাখানায় পরিবর্তিত করিয়াছে। কাজ শুধু পড়ে তাহাদেরই উপর, যাহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন অধিক। সুকোমলা শ্রীলতা রায় একটি জবরদস্ত পুরুষ অপেক্ষা বেশী কাজ করে।

কিন্তু, আজ বিদ্রোহ। আজ শ্রীলতা রায় বিদ্রোহ করিবে। যে বিদ্রোহের ফলে সে পরিবারে অপ্রিয় হইয়াছে, যে বিদ্রোহে সে দীপঙ্করকে প্রত্যাখ্যান করিয়া

স্বকীয় স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছে, সেই বিদ্রোহে তার ভয় পাইলে চলিবে না। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা বজায় রাখিতে হইবে। মাতাপিতার মনে সে কষ্ট দিতে দ্বিধা করে নাই। এখন কাপুরুষতা কেন?

শ্রীলতা টেবিলের জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিল। হাত-ব্যাগ খুলিয়া চিরুণীতে চুল আঁচড়াইয়া লইল। দিনশেষের সে অপেক্ষা করিবেনা। শারীরিক অবস্থা কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। তাহাই যথেষ্ট।

দরজার কাছে শ্রীলতাকে দেখিয়া সকলে তাকাইল। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন শ্রীলতার দর্শন পাওয়া যায় না। আর দেখিবার মতই সে। ক্ষীণ, উজ্জ্বলগৌর দেহ বেষ্টন করিয়া পাতলা সুতী কালপাড় শাড়ী, কালো রেশমের জামা। অতি লালিত্য, অতি পালিশে চারিপাশের বড় বড় টেবিল চেয়ার ও কাগজের স্তূপের মধ্যে শ্রীলতা অসঙ্গতি।

শ্রীলতা ইতস্তত করিতে লাগিল। অফিসের নিয়ম সে সরাসরি লঙ্ঘন করিতে চায়না। কাহাকেও না বলিয়া যাওয়া হয়তো নিয়ম নয়। বাধা দিলেও আজ কেহই তাহাকে রাখিতে পারিবেনা সত্য, তবু নিজের দিক হইতে অপরাধ সে করিতে চায়না।

মাধুরীলতা দত্ত শ্রীলতার মতই সিনিয়র ক্লার্ক। এম-এ, বি-টি, পাশ করিয়াছে। হোঁৎকা ও মোটা। ঘোর কালো রঙে নীল চৌখুপী ধনেখালির লাল পাড় শাড়ী সদ্যঃক্রীত অবস্থায়। শাড়ী এধারে ওধারে ফুলিয়া আছে। বড় বড় চেক্ মাধুরীলতাকে বিরাট ও বিকট রূপ দিয়াছে। কট্‌কটে পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ রাখিয়া লাল ভেলভেটের জামা, চক্‌চকে জরির ফুল বোনা। পায়ে খট্‌খটে হিলের শব্দ তুলিয়া শাড়ী টানিতে ও এদিক্ ওদিক দৃষ্টি হানিতে হানিতে মাধুরীলতা ক্লোক্‌রুম হইতে ফিরিতেছিল। পথে সহসা শুভ্রবেশা শ্রীলতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া বিপদে পড়িল।

মাধুরীলতা ঢাকার সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ীর মেয়ে। বিবাহের প্রতীক্ষায় বয়সে ভাঁটা ধরিয়াছে! একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না, বিশেষতঃ লেখাপড়া জানে যখন। তাই একটি কাজ জুটাইয়া লইয়াছে। মাধুরীলতার বিশ্বাস, সে বেশ ভাল দেখিতে। নানা বিচিত্র বেশভূষায় তাই আলস্য নাই তার। আজও নূতন শাড়ী এবং দামী জামায় সাজিয়া মনে গর্ব ছিল, খুব মানাইয়াছে। সহসা শ্রীলতাকে দেখিয়া সে অস্বস্তি-বোধ করিল।

মাধুরীলতা যখনই কেননা শ্রীলতাকে দেখে বিনা কারণে এক অদ্ভুত অস্বস্তির ভাব অনুভব করে। তাহার হাত পা গুলি হঠাৎ বৃহৎ হইয়া যায়। সে তাহাদের লইয়া কি করিবে বুঝিতে পারে না। পোষাক হঠাৎ ফুলিয়া ওঠে, টানিয়াও সংযত করা চলেনা। মনে হয়, নাকের ডগা ঘামে ভিজিয়া বিশ্রী দেখাইতেছে; নখে ময়লা জমিতেছে বুঝি; ঠোঁটের পাশে ব্রণটী হু-হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে; ইত্যাদি অনেক অস্বস্তিকর কথা। সংযত পোষাকে অপ্রসাধিক রূপের দীপ্তি মুহূর্তের মধ্যে মাধুরীলতাকে মলিন করিয়া তোলে। মনে হয়, মাধুরীলতার কোন পৃথক সত্তা নাই, সে হঠাৎ শূন্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে।

অথচ, প্রথমে মাধুরীলতাই আলাপ জমাইতে যায়,—"আপনার নাম শ্রীলতা, আমার নাম মাধুরীলতা। দুইই লতা,—হা, হা।"

শ্রীলতার গোলাপী অধরের পাশে ক্ষীণ মাণিক-জ্বলা হাসি ভাসিয়া আসিল, সর্পী নয়নের প্রসন্ন দৃষ্টি চকিতে মাধুরীর কালো মুখের উপর খেলা করিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীলতা মরমে মরিয়া গেল—দুইই লতা!

আজ শ্রীলতার সহিত দেখা হইবামাত্র মাধুরীলতার মনে হইল তাহার নিজের দাঁতগুলি অত্যন্ত বড়। সুতরাং দুই ঠোঁট গুটাইয়া দাঁত ঢাকিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে মাধুরীলতা বলিল, "কোথা যাচ্ছেন?"

হাতের খামের মত লম্বা হাত ব্যাগটি টিপিয়া শ্রীলতা উত্তর দিল, "বড় মাথা ধরেছে। কাজ করা অসম্ভব। বাড়ী যেতে চাই।"

"তাহলে কিন্তু বলে যেতে হবে বড় সাহেবকে।" মাধুরীলতা উপদেশ দিল, "নইলে অনর্থ হবে।"

শ্রীলতা অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "যদি উনি না থাকেন?"

গাম্ভীর্যে ও আত্মস্ফীতিতে বড় মুখখানা আর একটু ফুলাইয়া মাধুরীলতা শ্রীলতাকে উপদেশ দিল, "তা'হলে সুপারকে বলতে হবে।" দাঁত ঢাকিবার চেষ্টাতে কথা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট হইলেও মাধুরীলতার আত্মমর্যাদা ফিরিয়া আসিল। দেবদূতীর মত সুন্দরীকেও উপদেশ দিতে হয়! সে ভার পড়িয়াছে মাধুরীলতার উপর।

শ্রীলতা বড় সাহেবকে যথানিয়মে অনুপস্থিত দেখিল। বাধ্য হইয়া বাঙ্গালী সুপারের কাছে আর্জি পেশ করিল, "মাথা ধরেছে, বাড়ী যেতে চাই।"

ধূর্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বৃদ্ধ সুপার বলিলেন, "তা, বাড়ী যাবার দরকার কি? কাজ না করে বসে থাকলেই হয়।"

শ্রীলতার মধ্যের বিদ্রোহিনী জাগিয়া উঠিল, "আমি একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই।"

সুপার চশমার কাঁচের মধ্য হইতে রুক্ষভাবে চাহিলেন, "নিরিবিলিতে থাকতে হলে কাজ নেওয়া চলে না।"

শ্রীলতা তাহার দিকে স্থির লক্ষ্যে চাহিয়া রহিল,—সিনিয়র ক্লার্ক শ্রীলতা রায় নহে—রায়-বংশের শ্রীলতা রায়। সর্পীচক্ষে তাহার উগ্র বিস্ময় ও আত্মমর্যাদা। তুমি সামান্য প্রৌঢ়, অফিসের কেরাণীগিরিতে চুল পাকাইয়া শ্রীলতাকে শাসন করিতে চাও! শ্রীলতার মাথাধরার উপশমে সমগ্র অফিসকে যাহারা কিনিতে পারে, তাহারাও শ্রীলতার প্রতি মুহূর্তের জন্যও রূঢ় দৃষ্টিতে তাকায় না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। সরকারী অফিসের নীচের তলা হইতে যাহারা কায়ক্লেশে ঊর্দ্ধে ওঠে তাহাদের রক্তের মধ্যে 'ব্যুলি' নামক জীবটি সর্বদাই বাস করে। জীবনে ঘা খাইয়া উঠিতে হইয়াছে, সুতরাং বিনা আঘাতে কেহ সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও ভোগ করিবে, এ চিন্তা তাহাদের অসহ্য। দুর্বলকে অযথা উৎপীড়ন করিয়া, সবলের পদলেহন করিয়া, ওপরওলার স্পাই-গিরি করিয়া এইসব কেরাণী-টু-অফিসারদল নিজের কাজ বজায় রাখে। এমন কি, কাজ বজায় রাখার প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলেও কেবল অভ্যাসবশতঃই স্বভাব ছাড়িতে পারে না। সরকারী দপ্তরখানায় এইসব জীবের সমাবেশ প্রচুর। জানিনা কংগ্রেস সরকার ইহাদের লইয়া স্বাধীনতার পরে কি করেন।

"তা', একদিন। হ্যাঁ, যেতে পারেন। কিন্তু, এখনও আমি বলবো বড় সাহেবকে জানানো উচিত।"

"কি আশ্চর্য! তিনি কি অফিসে আছেন, যে জানাবো?"

"আপনার অপেক্ষা করা উচিত। তিনি এলে বলে যাবেন।"

"তিনি যদি না আসেন আর? অনেকদিন তো ফিরে আসেনই না? কখন আসবেন সেজন্যে বসে থাকলে ছুটি নেওয়ার দরকারই বা কি?"

সুপার চুপ করিয়া রহিলেন।

"দু'তিন ঘণ্টা তো ছিলামই। সামান্য ক'ঘণ্টা বাকী। সে ছুটিটাও আপনি দিতে পারেন না? বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে হয়! আশ্চর্য!" স্বল্পভাষী শ্রীলতা মুখর হইয়া উঠিল।

মেয়েটির দুঃসাহসে সুপার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। অথচ তাঁহার দীনতা যেন ইহার কাছে গোচর হইয়া উঠিতেছে। তাই কড়া কথাও তাঁহার রসনায় আসিতে

চাহিলনা। বেয়ারা সই করিবার জন্য ফাইলের বোঝা আনিল। সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি ফাইলে মনোযোগী হইলেন শ্রীলতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া।

শ্রীলতা দাঁড়াইয়া রহিল। যাইবে সে অবশ্যই। কিন্তু, আর কিছু বলা উচিত কি না বুঝিতে পারিলনা। সুপারের নিকট অন্য একটি অফিসার আসিলেন। শ্রীলতাকে উপেক্ষা করিয়া সুপার তাঁহাকে বসাইয়া সাদর আপ্যায়নে বিগলিত হইয়া পড়িলেন।

আরক্ত মুখে শ্রীলতা বাহির হইয়া রাস্তায় নামিল।

ছয়

বাড়ী তাহার চিরন্তনী শাসন ও অসন্তোষ লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। উপযুক্ত পাত্রকে প্রত্যাখ্যানপূর্বক বড় বংশের নাম ডুবাইয়া পরের দুয়ারে সামান্য চাকুরী, —রায়-বাড়ী এ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে না। বড় ভাই, মা কথা বলেন না। অন্যান্য পরিজনেরাও বিরূপ। কেবল বড়বৌদি ও ছোট বোনেরা খুসী। জয়ার ভাই যে কাজে সাহায্য করিয়াছে, সে কাজ জয়ার নিকট মন্দ হইতে পারে না। শ্রীলতার সামান্য উপকারটুকু করিয়া দিতে পারিয়াছে, তাই জয়া ভ্রাতৃগর্বে কিঞ্চিৎ মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

জয়ার পিতৃগৃহে মেয়েরা বাধ্য হইয়া কাজ করে। এতদিনে শ্বশুরগৃহের মেয়েও রাজপথে নামিল। সুতরাং সামঞ্জস্য আসিল। শালীনতা-শালিনী শ্রীলতা অসামান্য নাই। তাহাকে সম্ভ্রম করিতে হইবেনা। জয়া রাতারাতি শ্রীলতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রীতি সন্তুষ্ট হইয়াছে, শুধু দিদির নামমাত্র মাসোহারা পাইয়া নয়। নিস্তরঙ্গ রায়-বাড়ীর স্রোতে শ্রীলতা জোয়ার তুলিয়াছে বৈচিত্র্যের। নূতন একটা কিছু হইতেছে, এই আনন্দে সম্পা খুসী। চাইকি, দিদির পথপ্রদর্শনের পরে সম্পাও গৃহের গন্ডির বাহিরে স্বাধীনতার সড়কে পদক্ষেপ করিতে পারিবে। তাই সেই স্বপ্নে বিভোরা সম্পার কণ্ঠে নানা ভাষার গান আজকাল অহোরহ ধ্বনিয়া ওঠে।

বিনতা-মালতী খুসী, কারণ দিদির অযাচিত দান তাহাদের সর্বগ্রাসী অভাবকে কিছু মিটাইয়া এটা-ওটাতে ভান্ডার পূর্ণ করিয়া তোলে। টাকা চাহিলে পাওয়া যায়।

আজও বিনতা সেই উদ্দেশে শ্রীলতার কাছে আসিয়াছিল। অসময়ে রাঙা দিদি ফিরিয়াছে, ভালই। মাথার শিয়রে বসিয়া বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?"

শায়িত অবস্থায় জলপটী-বাঁধা ললাট শ্রীলতা দেখাইল, "এইজন্যে।"

"ও!" বিনতা স্থির করিয়া লইল দিদির কার্যস্থলটি বড় ভাল। মাথা ধরিলে স্কুলে ছুটি মেলেনা, কিন্তু অফিসে মেলে।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিনতা বলিল, "সেই টাকাটা দেবে, রাঙাদিদি? এখনই দরজী আসবে।"

"হাতব্যাগ থেকে নিয়ে যা। দেখিস, পাঁচের বেশী নিসনা যেন। সারা মাস পড়ে রয়েছে আমার।"

"না, না পাঁচেই হবে জামাটা।" বিনতা বেণী দুলাইয়া টাকা বাহির করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

সহসা বিনতার স্বচ্ছন্দ গতি শ্রীলতার অসহ্য লাগিল। কি পরম আনন্দেই আছে মেয়েটা! কোন চিন্তা নাই, সমস্যা নাই। আধুনিক ফ্যাশানের জামায় আধুনিক লেশ সজ্জার টাকা যোগাড় হইলেই ওর জগৎ পুলক-প্লাবনে ভরিয়া যায়! রায় বাড়ীর মেয়ে হইয়া কেন ও এত সুখী হইবে!

রুক্ষ গলায় শ্রীলতা ডাকিল, "বিনি, মাথাধরা কেমন আছে একবার জিজ্ঞেসও করতে পারতিস।"

চলিতে বিনতা বাধা পাইল, আপেলের ন্যায় স্বতঃরক্তাভ গাল দুইটি তাহার আরও লাল হইয়া উঠিল, "বাঃ কমেনি যে সেতো দেখতেই পাচ্ছি। নইলে কি মাথায় জলপটি লাগিয়ে শুয়ে থাকতে?"

"তোর তো উচিত ছিল খোঁজ নেওয়া। টাকাটা নিতেই এসেছিলি।"

বিনতা গর্জিয়া উঠিল, সর্পীর সহোদরা সে সর্প-শিশু। "টাকা চাইনে, এই নাও। নিজেই তো সেধে দিতে চেয়েছিলে। নইলে এতদিন কিছু তোমার টাকা নিয়ে বড়লোক হয়নি কেউ।"

শ্রীলতা নরম হইল, "কেন রাগ করছিস, বিনি? মা তো কথাই বলেন না! তোরাও একটু আমার দিকে তাকাসনা।"

"কেন তাকাব শুনি? তুমি কার দিকে তাকাও?" বিনতা অদৃশ্য হইয়া গেল পলকে; অবশ্য টাকাটা ফেলিয়া গেলনা। শ্রীলতার পরের জেনারেশন সে, অতটা আদর্শবাদী নয়।

সত্য কথা। শ্রীলতা কাহারও দিকে তাকায় নাই। মানসিক বিলাসে মত্ত শ্রীলতা রায়। অতি প্রাচীন বনেদি বাড়ীর রীতিনীতিতে আঘাত করিয়া আপনার সামান্য

ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতেছে সে! এই ইচ্ছাপূরণ তাহাকে কোথাও লইয়া যাইবে না। কেবল নিজের উপর কোন ক্ষমতা নাই বলিয়া অক্ষমার এই আত্মবিলাস। সাতাশ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয় নাই। সুযোগ্য পাত্রকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কেবল রুচিবিকারের জ্বালায়। বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিককে অনাত্মীয়ের দাসত্ব, অভাবকে প্রতি-মুহূর্তে মানিয়া লওয়া, মোটা চালের পোলাউ খাওয়া, এসব তো দীপঙ্করকে বিয়াহের পর্যায়েই পড়ে। এসব সহ্য হইতে পারে, কিন্তু দীপঙ্করকে সহ্য হইবে না! এত বিলাস শ্রীলতার শোভা পায়না।

"ওজিসান্, ওজিসান্, ও কোকু, ও কো কু!" গাহিতে গাহিতে সম্প্রীতি প্রবেশ করিল।

"ও আবার কি ভাষা শুনি?"

"ইস্ একেবারেই ইয়ে তুমি একটা। জাপানী গান। 'ওজিসান' ওদের সূর্য-দেবতা।"

"রক্ষে কর। এসময়ে জাপানী গান গাওয়ার কি দায়িত্ব জানিস, এই যুদ্ধের বাজারে? ফিফ্‌থ্ কল্‌মিষ্ট ব'লে ধরে নিয়ে যাবে যে।"

"ইস্ দিদি, তোমার এখন সিডিশন্ সম্পর্কে জ্ঞান প্রচুর, না ?" সম্পা খাটে বসিল, "শুনলাম মাথা ধরে মেজাজ খুইয়ে শুয়ে আছ তুমি।"

"তোমার সংবাদদাতাকে বোল অর্ধেক সত্যি। মাথা ধরেছে, মেজাজ খোয়া যায়নি।"

"কিন্তু দিদি, মেজাজ তো প্রায়ই খোয়া যাচ্ছে আজকাল। কেরানীগিরি কি তোমার পোষায়? কোথায় রোলস্ থেকে নেমে আসবে তুমি, না, তুমি করছ কেরাণীগিরি!"

"নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে কেরানীগিরিও সম্মানের কাজ, সম্পা।"

"ভুল, দিদি। তুমি তো গলগ্রহ হ'তেনা। যে ছেলেবেলা থেকে তোমাকে ধ্যান করেছে, তার গলগ্রহ তুমি নও, জীবনের সার্থকতা। বড় একটা কাজ করতে পারতে, গৌরব হ'ত, যশ হ'ত, দশটা ভীতু মেয়েকে পথ দেখাতে পারতে, তবে বলতাম ভাল কাজ করছ। তা না, এই দশের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে কেরানীগিরি! এতে কোনই সম্মান নেই।"

"নিশ্চয় আছে। নিজের ইচ্ছাকে মূল্য দিতে একে বিদ্রোহ বলা চলে। যে বাড়ীতে কেউ কাজ করেনি, সে বাড়ীতে আমি মেয়ে হয়ে কাজ করছি। এ মনের জোর আছে আমার।"

"জোর নয়, জেদ। অমনোনীতকে বিয়ে করা তোমার কাছে যতটা মিথ্যা, নিয়ম-বিরুদ্ধে তোমার আচরণ এ'দের কাছেও ঠিক ততটাই মিথ্যা। সত্যতে যদি এ'রা না পৌঁছুতে পারেন, তবে তুমিই বা পারছ ব'লে গর্ব রাখ কেন?"

শ্রীলতা শ্লেষ করিল, "দিব্যি সাহিত্যিক-সাহিত্যক কথাবার্তা হয়েছে তোর, সম্পা। বেশ!"

সম্পা উত্তর দিল, দিদির দিকে বক্রকটাক্ষে চাহিয়া, "হ্যাঁ, তা হয়েছে দীপঙ্করদা'র কৃপায়। বাড়ীতে আসাযাওয়া ত্যাগ করলেও সবাইকে তিনি ত্যাগ করেননি একেবারে। একবাক্স বাংলা বই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

শ্রীলতা উত্তর দিলনা। সম্পা সতর্কভাবে বলিল, "কি বিশ্রী চেহারা হ'য়ে গেছে ওর! সেদিন ছোড়দার কাছে ক'মিনিটের জন্য এসেছিলেন। বল্লাম, 'আসেন না যে বড়?' উত্তর দিলেন, 'সময় পাইনে, দিদি।' কত করে বল্লাম, বসলেন না।"

শ্রীলতা অধর বক্র করিয়া কহিল, "হুঁ, তুই আবার কত করে বললি! কি যে দেখিস ওর মধ্যে?"

"সকলের পছন্দ তো সমান হয়না। রত্নের কাটে দাম বাড়ে। আবার বহু লোক আন্‌কাট্‌ রত্ন ভালবাসে।"

"উপমা কালিদাসস্য।"

শ্রীলতা বিরক্ত হইতেছে দেখিয়া সম্পা কথা পালটাইল, "দিদি, তুমি যে বুড়িয়ে গেলে, ভাই। কেরানীগিরি করতে করতে কেমন একটা মাষ্টারনী-কাম-ক্যারানী ভাব এসে গেছে তোমার এই কদিনেই। সেই চেহারা তোমার নেই, যা, দেখে কবি গাইবেন—

"অলকে কুসুম না দিও,
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিও,
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়দুয়ারে ঘা দিও—"

শ্রীলতার মুখ মলিন হইয়া গেল। তাহার নিজের রূপে তাহার অহঙ্কার নাই, পরিতৃপ্তি আছে। অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যপ্রিয়তার এ-ও একটি বিশেষত্ব। প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়াইয়া মান বাড়াইবার মনোভাবেই এই সৌন্দর্যের সজ্জা। সম্পার গীতিস্রোতে বাধা দিয়া সে কহিল, "সুতরাং?"

"দীপংকর লাহিড়ী, এস।"

"অসহ্য!" শ্রীলতা দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল।

না, না। সে দীপংকরকে কখনই বিবাহ করিবে না।

সাত

পরের দিন। দ্রুতবেগে প্রায় দৌড়াইবার মত শ্রীলতা সিঁড়ি ভাঙিয়া অফিসে উঠিতেছে। দশটায় হাজিরা, সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। একটির পর একটি ট্রাম জন-ভারাকুল অবস্থায় চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কোনটিতেই স্থান সংগ্রহ সাধ্যায়ত্ত হইয়া উঠিলনা। চোখে জল আসিল শ্রীলতার পণ্ডশ্রমে। সমগ্র জনতার বিরুদ্ধে অভিমানে কণ্ঠে বাষ্প জমা হইল। সকলের চক্রান্তে সে আজ লেট্। কালিকার ব্যাপারের পর আজিকার লেট্ হওয়া তাহার অপরাধকে নিঃসন্দেহে বর্ধিত করিল।

কোনক্রমে পরদা-ঘেরা জায়গাটিতে বসিবামাত্র মাধুরীলতা খস্খস্ শব্দে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিল, "মিস রয়, একটা কথা।"

"কি বলুন?" হাতব্যাগ ড্রয়ারে রাখিতে রাখিতে শ্রীলতা বলিল।

চাপালগায় ফিস্-ফিস্ করিয়া মাধুরী উত্তর দিল, "জানেন ভাই, সুপার আপনার নামে বড়সাহেবের কাছে লাগিয়েছে। আমি সেখানে ছিলাম।"

ঘটনা এই। বড়সাহেবেরও ওপরওয়ালা আছে। তাঁহার নিকট হইতে আঘাত আসিয়াছে। অফিসের এই শাখার কর্মপ্রণালীতে শৈথিল্য দেখা যায়। কারণ? সুতরাং বড়সাহেব ছোটসাহেবের উপর, ছোটসাহেব হেডক্লার্কের উপর, হেডক্লার্ক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্দের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বড়সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেন্টকে কঠিন প্রশ্ন করিলেন, "সকলের হাজিরে ঠিকমত চেক্ করা হয়?"

"হ্যাঁ, স্যার্।"

"কাল আমি বিশেষ কাজে বাইরে আটকে ছিলাম। সব ঠিক ছিল তো?"

"হ্যাঁ, স্যার।" কিন্তু ইহার পরে হেডক্লার্কের তলব পড়িবে। লোকটা তেমন সুবিধার নয়। পুরাতন পাপী, সুপারকে ভয় করেনা। কি জানি কি প্রকাশ হইয়া পড়ে? 'Prevention is better than cure.' অবলীলাক্রমে সুপার উত্তর দিলেন,

"সব ঠিক ছিল, সার্। শুধু মিস্ শ্রীলতা রায় অসুখ হয়েছে বলে ছুটী নিয়েছিলেন।"

"Who is she?"

বিশদ বর্ণনা শ্রবণান্তে বড়সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কি অসুখ আবার তার হ'ল?"

"আজ্ঞে, মাথা ধরেছিলো, সার্।"

টেবিল চাপড়াইয়া বড়সাহেব চীৎকার করিলেন, "ওঃ, মাথা ধরেছিল! তারজন্যে কামাই! এটা চাক্‌রী নয়?"

সুপার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আজ্ঞে, তিনি জোর করেই গেলেন, সার।"

মাধুরীলতা বন্ধুভাবে উপদেশ দিল, "এই বেলা সুপার ঘরে নেই। চট্ করে চলে যান সোজা বড়সাহেবের কাছে। বলুন গে, কাল আপনি ছিলেন না তাই না বলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। খুবই অসুখ বোধ করেছিলাম। আজ আপনি আসা মাত্র জানালাম।"

শ্রীলতার শুভ্র ললাটে মুক্তাহারের মত স্বেদকণা ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল, "এখনই যেতে হ'বে, পরে গেলে হয়না?"

মাধুরী ব্যাগ্র নিষেধে বলিল, "না, না। এক্ষুণি গেলে উনি ভাববেন সুপারের লাগানোর কথা আপনার কানে যায়নি। আপনি নিজে থেকেই কর্তব্য পালন কর্ত্তে এসেছেন।" কান দুইটি হঠাৎ বড় বোধ হওয়ায় চুলের দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে মাধুরী উপদেশ দিল জ্ঞানীর মত।

শ্রীলতা উঠিল। যত অপ্রীতিকরই হোক, এ কাজ সে করিবে। যে গৃহ হইতে দম্ভের সহিত বাহির হইয়াছে, সেই গৃহে পরাজয় লইয়া সে ফিরিবে না। অধিক চিন্তা উচিত নয়, তাহা হইলে দ্বিধা আসিবে। ঝোঁকের মাথায় যাহা হয় বলিয়া আসা যাক্। শ্রীলতা রুমালে কপালের স্বেদ না মুছিয়াই বড়সাহেবের ঘরে ঢুকিল। দেবদূতীকে উপদেশ দিবার আত্মপ্রসাদে স্ফীতা মাধুরীলতা নিজের জায়গায় বসিতে গেল।

ঘরে বড়সাহেব একা নহে। দরজার দিকে পিছন করিয়া আর এক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। অতিব্যস্ততায় শ্রীলতা ভদ্রতার মাপ্‌কাটি বিস্মৃত হইয়া গৃহে

প্রবেশের অনুমতি লয় নাই। এখন অন্য একজন আছেন দেখিয়া 'ন যযৌ, ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। লজ্জায় ও অপমানে সে চোখে ভাল দেখিতেছিল না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বড়সাহেব মুখ তুলিলেন, "So, it is you! দেখছেন না, আমি ব্যস্ত আছি?"

অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া শ্রীলতা বলিল, "কাল আমি একটুক্ষণ ছুটি নিয়েছিলাম, তাই বলতে এসেছি।"

মান্য অতিথির সমক্ষে বড়সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি হইল। অভ্যাসবশতঃ টেবল্ চাপড়াইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আপনার ব্যবহারের কথা আমার কাণে এসেছে জানবেন। মুখে কিছুই শুনবোনা আমি, লিখিত কৈফিয়ৎ দেবেন।"

মান্য অতিথি চেয়ার ঠেলিয়া উঠিলেন। অজ্ঞাতসারে অস্ফুট যন্ত্রনার ধ্বনি তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল। শ্রীলতার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তিনি ত্রস্তে পলায়ন করিলেন।

বড়সাহেব সবিস্ময়ে বলিলেন, "ওকি, মিষ্টার লাহিড়ী? কাজের কথা শেষ না করে—"

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলতাও ঊর্দ্ধশ্বাসে বহির্গত হইয়া গেল।

আর কেন? শ্রীলতা রায় চরম অবমাননা লাভ করিল দীপঙ্করের সম্মুখেই! তাহার যে এখানে গতিবিধি থাকিতে পারে এবং সে যে আজ এখন ওই ঘরে উপস্থিত আছে, তাহা জানিতে না তুমি। যাহাকে সগৌরবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, তাহারই সম্মুখে তোমার গৌরব ধূলিসাৎ হইয়া গেল। উপর-ওয়ালার প্রসাদ-ভিক্ষু, পদ-লেহনকারী, নির্যাতিত, পরাধীন কেরাণীরূপে দীপঙ্কর লাহিড়ী তোমাকে দেখিয়া গেল। যে অভিজাতা অসূর্যম্পশ্যার চিত্র বাল্যাবধি মনে আঁকিয়া দীপঙ্কর তোমার পশ্চাতে হতাশ প্রেমে বিচরণ করিয়াছে, সে-ই তুমি এই তুমি! দীপঙ্কর আর তোমাকে চাহিবে না। তোমার মূল্য আর তাহার কাছে তুমি রাখিলেনা। ছোট হইতে বড় হইয়াছে দীপঙ্কর। বড় হইতে ছোট হইলে তুমি। আত্মসম্মান বজায় রাখিতে চাকুরী করিতেছ,—বড় বড় কথা মুখে! প্রকৃতপক্ষে অভাব মোচনের জন্যও নয়। যেদেশের সাধারণ ব্যক্তির আহার গড়ে ছয় পয়সা, অঙ্গে সিক্ত বসন শুকানো যে দেশের নারীর পক্ষে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, সে দেশে অন্ন-বস্ত্রের অভাব তো তোমার হয় নাই? তুমি বিলাস পাইতেছিলে না, তাই অস্বস্তি। পাঁচখানা ভাল কাপড়ের সঙ্গে আর দুইখানা আমেরিকান রেশমের শাড়ী নাই কেন? জুতার নূতন

প্যাটার্ণ পথে-ঘাটে দেখা যায়। যুদ্ধের জগতে বিলাস-বিহ্বলা নারীর গভীর অসন্তোষ তোমাকে স্পর্শ করিয়াছিল নিঃসন্দেহে। ভারতবর্ষের দুহিতা তুমি, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মাধুরী উপেক্ষা করিয়া বস্তুতান্ত্রিক পশ্চিমী সভ্যতার আকর্ষণে সরকারী গোলামখানায় গোলাম হইয়াছ। কেন, শ্রীলতা রায়? তোমার তো ঘরে রুগ্ন স্বামী, ক্ষুধার্ত্ত সন্তান নাই। ঠিক! দীপঙ্করের সম্মুখে তোমার এই অপমান সঞ্চিত ছিল। ভালবাসাকে তাচ্ছিল্য করিয়া অন্যের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছ তুমি। এখন ফলভোগ কর।

প্রায় দুইঘণ্টা নিস্পন্দ হইয়া শ্রীলতা ঘেরা জায়গাটুকুতে বসিয়া রহিল। কোন কাজ করিবার সাধ্য হইল না তাহার। অতি-আঘাতে চোখে জলও আসিল না। জিনিষপত্র গুছাইয়া অবশেষে শ্রীলতা উঠিয়া আজও অসময়ে বাহির হইয়া গেল। আজ অনুমতি লইবার প্রয়োজন হইল না।

ছোট শেড্, সাধারণ কুশ্রী জিনিষপত্র। তবু কোথায় যেন আঘাত লাগে ছাড়িতে। মনে হয়, কাল এইখানে বসিব না। এই সমস্ত জিনিষ আমার প্রয়োজনে লাগিবে না। এই দোয়াত, এই কলমে অন্যের স্পর্শ পড়িবে। শত দিনের শত অসুবিধা তুচ্ছ হইয়া যায়। মনে হয়, গৃহের সোনার পিঞ্জর প্রত্যাগত পাখীর কাছে পিঞ্জরই প্রতীয়মান হইবে। দুঃখ তাহাকে বৃহৎ জীবনের স্বাদ দিতেছিল। সে জীবন রায়-বাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে নাই।

তবু শ্রীলতা মনোস্থির করিল। কাল সে আসিবেনা। যে কোন ভাবেই হোক এ অফিসের সহিত দীপঙ্করের যোগ আছে। শ্রীলতা না দেখিলেও হয়তো সে পূর্বে আসিয়াছে। নিজের সম্মান হারাইয়া কার্যস্থল শ্রীলতার নিকট নরক। সুতরাং সে আর আসিতে পারিবেনা। সে অন্য কি কাজ পাইবে? লোকের মধ্যে বাহির হইবার উপযুক্ত নয় সে। কাজ করে যাহারা, নারিকেলের খোলার মত শক্ত আবরণে তাহারা কোমলতাকে লুকাইয়া রাখে। শ্রীলতা রাঁধুনিগিরি করিবে। লোকচক্ষের অগোচরে রান্নাঘরের এঁদো কোণে বসিয়া রান্না সে করিবে জীবিকার অন্বেষণে। একবার বড়বৌদি দাদাকে অবশ্য ঘটনাটি বলা দরকার। কারণ, তাঁহারই সাহায্যে কাজটী হইয়াছে।

ট্রামষ্টপে ঘড়ি দেখিল শ্রীলতা, দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। মণীশদা এখন অফিসে। বড়বৌদির পিত্রালয়ে কোনদিন একা না গেলেও মণীশের অফিসে সে একাই যাইবে। তাহার সম্ভ্রম কি অবশিষ্ট আছে?

মণীশ মজুমদার বেয়ারার হাতে শ্রীলতার নাম লেখা শিলপ পাইয়া বিস্মিত হইল। রায়-বাড়ীর মেয়ে তাহার অফিসে একা দর্শনপ্রার্থিনী, ঘটনাটি অচিন্ত্য। ছোট অফিসার মণীশ, তার নিজস্ব ঘর আছে। সাগ্রহে শ্রীলতাকে সে ডাকিয়া লইল।

"এখানে বসে কথাবার্তা বলা চলে কি তোমার সঙ্গে? চল, বাড়ীতে যাই। একটু আগেই ছুটি নিয়ে আসছি।"

ইতস্ততঃ করিয়া শ্রীলতা সম্মত হইল। এ বিষয়ের নিষ্পত্তি এখনই করা দরকার।

মণীশ ছুটি লইয়া আসিল। অনেক লোকের ঈর্ষা-প্রশংসা-মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া শ্রীলতার সঙ্গে বাহির হইয়া দিল-দরিয়া মেজাজে একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া উঠিল। শ্রীলতাকে ট্রামে বাসে তোলা তাহার কাছে নেহাৎ অসঙ্গত বোধ হইল।

মণীশের বাড়ীর বিস্মিত দৃষ্টিতে সঙ্কুচিতা শ্রীলতা মণীশের শোবার ঘরে আশ্রয় লইল। মণীশের পত্নীর ঈর্ষা-কাতর মুখভাব, মণীশের আত্মশ্লাঘা সমস্ত কিছুই অবান্তর; গুরু সমস্যায় পীড়িত মনে প্রবেশ করে না।

"কাজটা কি ভাল করলে, শ্রীলতা? যদি কাজ করতেই হয় এখানে সুবিধা হত তোমার।"

মণীশের কথায় শ্রীলতা বিরক্ত হইল, "ভারী সুবিধে! কেরাণীগিরিতে জীবন-পাত।"

"কেরাণীগিরি তোমাকে বেশীদিন করতে হতনা, শীগগীরই প্রমোশন পেতে।" শ্রীলতা একটু অবাক হইয়া মণীশের দিকে চাহিয়া রহিল। অফিসে যদি তাহার সম্মান থাকিত, এ অবস্থায় তো তাহাকে পড়িতে হইত না।

ইতিমধ্যে মণীশের স্ত্রী চা-খাবার লইয়া আসিল। শ্রীলতা ও মণীশের সামনে চা ও খাবার যথাক্রমে সাজাইয়া দিতে দিতে বলিল, "খাও বড়মানুষের বোন। কখনও তো পা পড়েনা গরীবের বাড়ীতে। আজ বুঝি সূর্য পচ্চিমে উঠেচে।"

মণীশের স্ত্রীর ছদ্ম-প্রফুল্ল, কাটা-কাটা কথা শ্রীলতাকে স্পর্শ করিল না। যন্ত্রচালিতের মত সে চা তুলিয়া লইল। প্রয়োজনীয় কথার মধ্যখানে মণীশের স্ত্রীর হানা উপদ্রব মাত্র।

মণীশ বুঝিল, স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ওগো, গোটাকত পান সেজে আননা।"

"যাচ্ছি গো, যাচ্ছি। কথাবার্তা শুনতে আসিনি।" কোমর ও ঘাড় দুলাইয়া মণীশের স্ত্রী প্রস্থান করিল।

শ্রীলতা চায়ের কাপ নামাইয়া প্রশ্ন করিল, "এত ক্ষমতা যখন আপনার, যে আপনার ক্যাণ্ডিডেট চার মাস কাজ করেও প্রোমোশন পেতে পারে, তাহলে সুপারিণ্টেডেণ্ট আর ডিরেক্টর দু'জনে আমার জীবন অস্থির করে তুলেছিলেন কেন, শুনি?"

মণীশ রহস্যের হাসি হাসিল, "তাদের ওপরওয়ালার কাছে ধরাও করা হয়েছে। ওরা সে কথা জানে না। জানলে তোমাকে একটিও কথা বলতে সাহস পেত না।"

শ্রীলতা পুনরায় বিস্মিত হইল। অত্যন্ত সামান্য ঘরের ছেলে মণীশ, সাধারণ কাজ করে। বড়সাহেবের উপরওয়ালাও মণীশের হাত-ধরা! কে জানে কাহার কত প্রভাব আছে?

"কিন্তু তুমি যে কিছু খাচ্ছনা, শ্রী। লক্ষ্মীটি, মন খারাপ করো না। খাও একটু।" মণীশের গলার স্বর শ্রীলতার আত্মবিস্মৃতিতে অকস্মাৎ কষাঘাত করিল। 'শ্রী' বলিয়া কেহ তাহাকে ডাকে না। দাদার যুবক শ্যালক তাহার এত অন্তরঙ্গ নয়, যাহাতে সাতাশ বৎসরের তরুণীকে আদর করিয়া 'লক্ষ্মীটি' ডাকা চলে। মণীশের মুখে চোখে স্নেহ নাই, আছে অন্যভাব। আশ্চর্য! সমস্ত পুরুষই সমান! হয় তাহারা অত্যাচারী, নয় তাহারা লম্পট।

শ্রীলতা উঠিয়া দাঁড়াইল, "আমার শরীর ভাল নয়, খেতে পারবো না।"

এই শ্রীলতা রায়! দরিদ্রকন্যা জয়ার অভিজাতা ননদী। ইহাকেই মজুমদার বাড়ীর প্রত্যেকে চেনে। ক্ষণপূর্বের শ্রীলতা আর এ শ্রীলতার মধ্যে অনেক পার্থক্য।

মণীশও উঠিয়া দাঁড়াইল, বিদ্রুপের সহিত বলিল, "কাজের ওপর তোমার কোন মমতা নেই, দেখা যাচ্ছে। অনর্থক ফার্স করতে কাজটা নিয়েছিলে কেন?"

দরজার বাহির হইয়া শ্রীলতা সিঁড়িতে পা দিয়াছিল। ঘাড় ফিরাইল, "আমার কাজ যোগাড় করে দেবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেলাম।"

সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া চাপারাগে মণীশ বলিল, "ধন্যবাদটা যথাস্থানে পেঁছে দিও। আমার মত সামান্য লোক তোমার মত অসামান্য মেয়েকে কাজ দিতে পারে না। দীপঙ্কর লাহিড়ী আমার বেনামীতে তোমার কাজটা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

আট

আবার দীপংকর! রাস্তায় পাগলের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে চলিল শ্রীলতা। জীবনের সর্বত্র দীপংকর। দীপংকরেরই অনুগ্রহ অজ্ঞাতসারে শ্রীলতাকে লইতে হইয়াছে। প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবার গর্বে ছয় মাসের কৃচ্ছ্রকে গ্রাহ্য করে নাই শ্রীলতা। প্রতিমুহূর্তে নিজের কৃতিত্বকে ধন্যবাদ দিয়াছে। সাপ্লাইতে সে কাজ চায় জানিয়া গোপনে দীপংকর মণীশের সাহায্যে এই কাজ দিয়াছে। তাই অফিসে ঘেরা জায়গাটুকু মিলিয়াছিল। হায়, হায়! সুন্দরী শ্রীলতার কোন মূল্য নাই। যে পুরুষ তাহার রূপ কিনিতে চায়, তাহারই অর্থ ও সামর্থের মূল্যে শ্রীলতার মূল্য।

এখন তবে পরাজয়। যে দিকেই হোক, পুরুষের উদ্যত বাহু তাহার প্রতি প্রসারিত। নারীকে সব সময় পুরুষের হাতে পড়িতে হইতেছে। শ্রীলতা, যাও। দীপংকরের কাছে বধ্যভূমির পশুর ন্যায় নিজেকে উৎসর্গ কর। বল, 'তোমার শক্তির যূপে এই ছাগশিশু উৎসর্গীকৃত হইল।'

না, না। শ্রীলতা বিদ্রোহ করিবে। শ্রীলতা আত্মসমর্পণ করিবে না।

দীপংকরকে সে কোন ক্রমেই বরণ করিতে পারিবে না। যা হয় হোক। নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শ্রীলতা পলাইয়া থাকিবে। বাহিরের জগৎ তাহার সন্ধান পাইবেনা।

দ্রুত পলায়ন করিতেছে শ্রীলতা। ট্রাম-বাসে উঠিবার কথা মনে আসিল না। একটির পর একটি বিপর্যয়ে সে বিক্ষিপ্তা। লোকজনের ভীড় ঠেলিয়া, যান-বাহনের পাশ কাটাইয়া শ্রীলতা পলায়ন করিতেছে, নিজের গৃহের অবলুপ্তিতে বাঁচিবার আশায়। না, না। দীপংকর কখনই তাহাকে পাইবে না। আরও বেগে সে ধাবিত হইল।

কিন্তু, মিলিটারী যুগে অন্যমনস্ক পথচারীর অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাকে আজ ভোগ করিতে হইল। চলন্ত বাসের ধাক্কায় অন্যমনা শ্রীলতা সহসা পাশের ল্যাম্পপোস্টের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল বেকায়দায়। জনতার চীৎকার, শারীরিক যন্ত্রণা, সমস্ত কিছুকে দমন করিয়া কিন্তু শ্রীলতার ইচ্ছাশক্তি জাগিয়া রহিল। শ্রীলতাকে যাইতেই হইবে। এই জগত তাহাকে পাইবেনা। নিরাপদ আশ্রয় তাহার আছে। এখনই যাইতে হইবে। শ্রীলতার অবচেতন সত্তা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "লাগেনি কিছু। বাড়ী যাব। এক-খানা ট্যাক্সি ডেকে দিন না।"

ট্যাক্সিতে উঠিয়া চালককে কোন মতে ঠিকানাটা বলিয়া ক্ষণিকের জন্য শ্রীলতা মূর্চ্ছাহত হইয়া গাড়ীর গদিতে মাথা রাখিল।

"মেমসাহেব, বাড়ী এসেছে।" চালকের পাশের ব্যক্তি বাড়ীর দিকে সম্ভ্রমে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দরজা খুলিয়া ধরিল।

"এ কোথায় আনলে?" ঠাণ্ডা বাতাসে এতক্ষণে শ্রীলতা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

"কেন, এই তো ২৮নং চৌরঙ্গী। মেমসাহেব তো এই ঠিকানাই দিয়েছিলেন।" ড্রাইভার বলিল।

দীপঙ্করের বাড়ী। শ্রীলতার অবচেতন মন এখানে আসিতেই নির্দেশ দিয়াছে। শ্রীলতার মুখ দিয়া এই ঠিকানাই বিপদের মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়াছে, নিজের বাড়ীর ঠিকানা নয়। শ্রীলতা তাহা হইলে এই ঠিকানায়ই আসিতে চায়! দীপঙ্করের দারোয়ান গেট খুলিয়া সেলাম করিল। ড্রাইভার ভাড়া কত উঠিয়াছে বলিয়া দিল।

এই ভালো। শ্রীলতার আর সংশয় নাই। আসক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে নিজের জিদেই শ্রীলতা ক্লান্ত। গোপন মন তাহার এই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছিল।

সে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে বসিবার ঘরে চলিয়া আসিল। বাঙ্গালী খানসামা পরদা তুলিয়া ধরিল। খানসামা কোন কথা বলিল না, একটু বিস্মিত হইল।

শ্রীলতা পাখার নীচে নরম সোফায় বসিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। দীপঙ্কর বাড়ী নাই, দেখা যাইতেছে। তা'হোক, শ্রীলতা অপেক্ষা করিবে। দীপঙ্কর তো বহুদিন অপেক্ষা করিয়াছে। এখন শ্রীলতার অপেক্ষার পালা।

খানসামা শীতল পানীয় ও খবরের কাগজ রাখিয়া গেল। পরম আয়াসে শ্রীলতার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। পাঁচটা বাজিয়াছে। এখনই দীপঙ্কর আসিবে। আঃ, কি আরাম, কি আনন্দ! কোন অভাব, অভিযোগ নাই। জীবনে স্বস্তির সমস্ত সামগ্রী তাহার উদ্দেশে সাজাইয়া রাখিয়াছে একজনের জীবনব্যাপী পরিশ্রম। সে-ও তো পুরুষ। সে অত্যাচারী নয়। শ্রীলতার কর্ম সংগ্রহ করিয়া দিয়া শ্রীলতার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে। সে লম্পট নহে। ছলেও কোনদিন শ্রীলতার হাতটিও সে স্পর্শ করিতে চায় নাই।

আর সংগ্রাম করিতে হইবে না, এখন শান্তি। শ্বেতপত্র হস্তে শ্রীলতা বিজয়ীর দুর্গে আসিয়াছে। আশ্রয় পাইল সে।

দীপঙ্করের কুকুরের চীৎকারে শ্রীলতার আলস্য-তন্দ্রা অন্তর্হিত হইল। কাল মিশমিশে গ্রে-হাউন্ড, ছিপ্‌ছিপে একখানা চাবুক যেন। কিন্তু, প্রভু ও বন্ধুর কাছে চড়াইপাখীর মত নীরিহ।

দীপঙ্কর আসিয়াছে। তাই কুকুরের কণ্ঠে বোধহয় অভ্যর্থনার সুর ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীলতা দ বাহিরে আসিল। আজ দীপঙ্করের ভাগে শুধু কুকুরের অভ্যর্থনা কেন?

চেনে-বাঁধা কু করের হাতে চেন্। দীপঙ্করের চিহ্ন নাই।

"ও চেঁচাচ্ছে কেন?"

"বাথরুমে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হুজুর. আপনাকে দেখেছে। কাছে যেতে চাইছে। বেঁধে রাখি ওকে।"

"না, ছেড়ে দাও।"

শ্রীলতা ফিরিয়া সোফায় বসিল। চাবুকের মত ছিপ্‌ছিপে কুকুর পায়ের উপর বিদ্যুৎগতিতে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। কোনদিন শ্রীলতা তাহাকে একটুও আদর করে নাই। তবু অবোধ জন্তু প্রভুর মতই শ্রীলতার একান্ত বশ্য।

শ্রীলতার পায়ে মুখ ঘষিয়া অস্ফুট স্বরে কুকুর কাঁদিতে লাগিল। আদর চায় বিবেচনা করিয়া শ্রীলতা তাহার মাথায় গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল, "জেড্, জেড, ওঠো।" বাধ্য জেড্ আজ অবাধ্য। শ্রীলতার কাছে কি যেন বলিতে চায়? একটা কিছু যেন জানাইবার আছে তার। ক্রন্দনের বিরাম নাই। কাল কুকুরের চাপা ক্রন্দনে ঘর ভরিয়া উঠিল। সন্ধ্যার ছায়াও নিবিড়তর হইতেছে। দীপঙ্করের আজ আড্ডা অথবা কাজের অন্ত নাই। আজন্ম সাধনা নিজে ধরা দিতে আসিয়াছে। দীপঙ্কর এখনও অনুপস্থিত!

জেডের নিরবিচ্ছিন্ন ক্রন্দনে শ্রীলতার অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। দরজার বাহিরে দীপঙ্করের খানসামা সবিনয়ে অপেক্ষা করিতেছিল। জেডের চাকরকে ডাকিয়া দিবার কথা বলিতে শ্রীলতা তাহাকে ভিতরে আহ্বান করিল। হয়তো জেডের খাবার সময় হইয়াছে।

"আচ্ছা. সাহেব কখন ফিরবেন?"

ভাবলেশহীন মুখে শিক্ষিত ভৃত্য উত্তর দিল. "তিনি এখানে নাই।"

"এখানে নেই মানে? কলকাতার বাইরে গেছেন? কবে?"

ভৃত্য ধীরে ধীরে বলিল, সাড়ে এগারোটার সময়ে সাহেব ব্যস্ত ভাবে বাড়ী ফিরিলেন। কিছু খান নাই। সঙ্গে লইবার জিনিষপত্র গোছাইয়া অফিসে গেলেন। ম্যানেজার সাহেবকে লইয়া আবার বাড়ী আসিলেন। দামী জিনিষপত্রের ব্যবস্থা হইল। ছোটবোন ও ভগ্নীপতিকে তার করা হইয়াছে। তাঁহারা এই বাড়ীতে আসিয়া থাকিবেন

ও দেখাশোনা করিবেন। অফিসের ভার ম্যানেজারের উপর। কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না, জেড্‌কে পর্যন্ত নয়।

রুদ্ধনিশ্বাসে শ্রীলতা প্রশ্ন করিল, "কোথায় গেলেন?"

তাহা কেহ জানে না, তিনটার সময়ে এরোপ্লেনে চলিয়া গেলেন। এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিবেন কি না তাহারা জানেনা।

কার্পেটের উপর জেড্‌ নিস্তব্ধভাবে পড়িয়াছিল। ঘরের ছাদের দিকে মুখ তুলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

দীপঙ্কর পলায়ন করিয়াছে। শ্রীলতার অপমান সে সহ্য করিতে পারে নাই। 'কমল-আসনাকে' 'ভিখারিণীর' সজ্জায় দেখিয়া জীবনে ধিক্কার আসিয়াছে। তাহার অন্তরের চির-অচঞ্চলা সাম্রাজ্ঞী প্রেম গ্রহণ করে নাই, অপমান বোধ করিয়াছিল। কিন্তু দাসত্বে তাহার মান যায় না? চোখ মেলিয়া দেখা দীপঙ্করের সাধ্যায়ত্ত নয়।

যাহাকে অমার্জিত মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে শ্রীলতা দ্বিধা করে নাই, তাহার শালীনতার কাছে আজ সে পরাজয় স্বীকার করিল। প্রেম যে হৃদয়ে জন্মলাভ করে সে-হৃদয়কে সে শ্রেষ্ঠ কাল্‌চার দিয়া সমৃদ্ধ করিয়া যায়। অভিজাত-তনয়া শ্রীলতা রায়ই সেই সূক্ষ্ম কালচারে বঞ্চিত আছে।

কিন্তু উপায় নাই!. ওইযে কুকুরের আর্তনাদে সারা গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে. সন্ধ্যার ম্লান কুহেলিকা বিষণ্ণ পটভূমি রচনা করিয়া দিয়াছে। সমস্ত গৃহে, সমস্ত আকাশে, সমস্ত জগতে বিদায়গীতি বাজিতেছে—বিদায়, বিদায়, শ্রীলতা!

‘শ্রীলতা ও সম্পা’

‘রায়বাড়ী’

এক
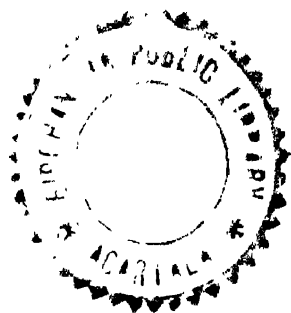
সাহিত্যচর্চা সম্পার কাল হইল। রক্ষণশীল রায়বাড়ীর দুহিতা। পুরুষেরা সাহিত্যিক হয় নাই, বড় জোর হইয়াছে সংগীতজ্ঞ। একদা-গৌরবময় অতীতের ধ্যানে তন্ময় তাহারা, ভবিষ্যতের দৃষ্টি কেবল অতীতকেই ফিরাইবার নিমিত্ত। ভবিষ্যৎ কিছু নয় তাহাদের কাছে; সংগীত-শিল্প—সাহিত্যের পটভূমিকা নয়, মানবতার জয়মুখর রঙ্গমঞ্চ নয়। ভবিষ্যৎ স্বর্ণপিন্ড মাত্র। পুরাণের হংস ভবিষ্যৎ। প্রতিদিন একটি করিয়া স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিলেই রায়বাড়ী কৃতার্থ হইয়া যাইবে। সেই স্বর্ণমূল্যে তাহারা ক্রয় করিবে অতীতের সম্পদ। এ এক তামসিক সাধনা। অতীতকে ফিরাইবার জন্য ভবিষ্যতের আরাধনা।

সম্প্রতি আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। রায়বাড়ীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, সম্পা ওরফে সম্প্রীতির দিদি শ্রীলতার পাণিপ্রার্থী দীপংকর লাহিড়ী হতাশার বেদনায় দেশ-ত্যাগ করিয়াছে। তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু শ্রীলতাদের মেজভাই অমিয়েন্দ্র ছিল দীপংকরের বন্ধু। তাহাকে একটি মোটা মাহিনার কাজ দিয়া গিয়াছে হিতা-কাঙ্ক্ষী দীপংকর। নিজের অফিসে পুরাতন ম্যানেজারের নীচেই অমিয়েন্দ্রের স্থান। অফিস হইতে নূতন মডেলের একখানা গাড়ী পর্যন্ত সে পাইয়াছে। মান্ধাতা-কালের রায়বাড়ীর গাড়ীখানা এখন বিশ্রাম পায়। গৃহিণী আজকাল ঘনঘন গংগা-স্নান করেন। বউএরা আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী যায়। মেয়েরা স্কুলে বাড়ীর গাড়ীতেই যায়। পুরাতন গাড়ীখানা এসব কাজে লাগে। নূতন গাড়ীটা সাধারণতঃ অমিয়েন্দ্র চালায়। একজন মাত্র ড্রাইভার। দুই গাড়ীর সে খবরদারী করে। মালতী, বিনতা কন্‌ভেণ্টে ভর্তি হইয়াছে। সম্প্রতি সিনিয়র কেম্ব্রিজের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীলতার নামমাত্র মাসোহারা বহুবর্ধিত করিয়াছে অমিয়েন্দ্র নিজে। কারণ, সে জানে তাহার কাজ নিজের গুণে হয় নাই। দীপংকরের সহিত বন্ধুত্বে হয় নাই। ধনী দীপংকরের এমন অসংখ্য বন্ধু আছে। শ্রীলতার ভ্রাতা হিসাবে অমিয়ের মূল্য। এখন শ্রীলতার হাতে অনেক টাকা আসে। চাকুরীর প্রয়োজন নাই। অনেক অবসর তাহার। নিজের ঘরে সব সময় কাটায় সে। অপূর্ব মুখের সুন্দর রেখায়, নয়নের অপার্থিব দৃষ্টিতে

কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। কেবল উদাস নয়নে যখন সে মাঝে মাঝে বাহিরের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তখন তাহার পরিজনেরা ভাবেন, 'ও কি দীপঙ্করের কথা ভাবে? ওর জন্য সে দেশত্যাগ করেছে। কখনও কি দীপঙ্করের দুঃখ ওর মনে বাজে না? ওকি অনুতাপ করেনা? দীপঙ্করকে ফিরে চায় না?'

প্রশ্নের উত্তর নাই। দীপঙ্কর অন্তর্হিত হইবার পরে প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সে বার্মায় আছে। গভীর রাত্রে কখনও বা শ্রীলতার ঘুম আসেনা। বাতায়নে বসিয়া থাকে সে। তাহাকে দেখিয়া সে সময়ে তাহার ভগিনী ও বৌদিরা ভাবেন, 'দীপঙ্করের কথা ও ভাবছে বোধ হয়।'

গৌর দেহবর্ণ শ্রীলতার পাণ্ডু হইয়াছে। তন্বী দেহলতা হইয়াছে ক্ষীণ। ভ্রাতারা ধরিয়া নেয় বিরহ।

গঙ্গাস্নানের পর শিবের মাথায় জল দিয়া রায়-গৃহিনী ফেরেন। কন্যাকে ডাকিয়া পুষ্প-নির্মাল্য দেন। মহেশ্বরের কণ্ঠের ধুতুরা-মাল্য পরান। নিরুত্তরে শ্রীলতা গ্রহণ করে। ইদানীং নীরব থাকে সে। মাতা মনে মনে বলেন, 'উমার সুদীর্ঘ তপস্যা যেমন সার্থক হয়েছিল তেমনি আমার শ্রীলতার দিকে মুখ তুলে তাকাও, ভোলানাথ। আর তুমি ভুলে থেকে না! দীপঙ্কর ফিরে আসুক।'

কিন্তু, এতো শ্রীলতার কাহিনী নয়। আমি শ্রীলতার বিষয়ে বেশী কথা বলিব না। 'লর্ড মেয়রে'র প্রত্যাবর্তনের কাহিনী এটা নয়। দীপঙ্কর ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্রীলতা আশ্রয় পাইয়াছে—যাঁহারা মিলনান্ত কাহিনী ভালবাসেন, তাঁহারা অনায়াসে চিন্তা করিয়া নিন এই সুখকর সমাপ্তি। বিরহে যাঁহারা আস্থা রাখেন, তাঁহারা একাকিনী নারীর নিঃসঙ্গ জীবন চিন্তা করুন। আমি সম্পার কথা বলি।

সাহিত্যচর্চা সম্পার কাল হইয়াছে! দীপঙ্কর তাহাকে অজস্র বই জোগাইত। দীপঙ্কর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, সম্প্রীতির সাহিত্যবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমান্বয়ে বই পড়ে। আজও ঘরে বসিয়া কোন অধুনিকী লেখিকার মনস্তত্ত্বমূলক পুস্তক পড়িতেছিল। ঘরে ঢুকিল অমিয়েন্দ্রের স্ত্রী ছায়া। ছায়া এতকাল যবনিকার অন্তরালে ছিল। বড় ভাই মহেন্দ্রের স্ত্রী জয়া সংসারের কাজকর্মে প্রাধান্য পাইত। অমিয়েন্দ্র বড় চাকুরী পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া জয়াকে অতিক্রম করিয়া পাদপ্রদীপের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিন বৎসর ছায়ার বিবাহ

হইয়াছে। বড় দুই জা, তারপর সে। আড়ালেই রহিত। হঠাৎ সে বধূসুলভ সঙ্কোচের বর্ম ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। স্বয়ংসিদ্ধ তথ্যের ন্যায় তাহার প্রাধান্য রায়বাড়ী নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তেমনি লইয়াছে জয়ার তিরোভাব। বাড়ীর অলিখিত আইন অদ্ভুত। কেউ আলোচনা করে না, কেউ নির্দেশ দেয় না। তথাপি, যথাসময়ে সে আইন চলে ঘড়ির কাঁটার নির্ভুলতায়। প্রতিবাদও কেউ জানায় না। পরিবারটির ভিতরে ভিতরে একটি স্রোত কাজ করে, কদাচিৎ বন্যার বহির্প্রকাশ হয়। পুরাতন ভাঙে, নূতন কূল গড়িয়া ওঠে।

ছায়া ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে আই. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিল। বনিয়াদী ঘরে বিবাহের লোভে কন্যার আসন্ন পরীক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া পিতা বিবাহ দেন। ফলে, পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। তবু ছায়া নিজেকে শিক্ষিতা মনে করে। সুন্দরী ভিন্ন রায়বাড়ীর বধূ নির্বাচন হয় না। জয়া, মেজভাই চপলেন্দ্রের স্ত্রী, উভয়েই নাম-করা সুন্দরী। অমিয়েন্দ্রের বেলায় অবস্থা পড়িয়া আসিয়াছিল। তাই একটা আপোষ করিতে হয়। ছায়া গাত্রবর্ণে শ্বেতাঙ্গিণী, কিন্তু মুখশ্রী অন্য বৌএর মত লাবণ্যযুক্ত নয়। লাবণ্য ও দেহচর্মের উৎকর্ষ—দুইএর মধ্যে রায়বাড়ী গায়ের চামড়াই বাছিয়া লইয়াছিল লাবণ্যের পরিবর্তে। দুইএর সমাবেশ পড়্তি ঘরে সুলভ নহে। নাক-চোখ থাক বা না থাক কালো মেয়ে রায়বাড়ীতে ছিলনা।

ছায়া সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে। রায়বাড়ীতে বড়ঘর হইতে বধূ আসা নিয়ম নাই। পূর্বপুরুষে একজন রাজকন্যাকে স্বীয় পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিয়াছিলেন। বধূ যখন পিত্রালয়ে ছিল তখন শ্বশুর দেখা করিতে গিয়া এত্তেলা পাঠাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৈবাহিক-মহারাজ তখনো বেলা দশটায় নিদ্রাগত ছিলেন। কর্মচারীরা তাঁহাকে চেনা সত্ত্বেও সোজা অন্দরে লয় নাই। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ নিজ জমিদারীতে ফিরিয়া আসেন ও এক সপ্তাহের মধ্যে পুত্রের এক দরিদ্র প্রজার রূপসী কন্যার সহিত বিবাহ দেন। তদবধিকাল রায়বাড়ীতে ধনীগৃহ হইতে বধূ আনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'এত্তেলা দেওয়া' কথাটা রায়বাড়ীতে আজও পূর্ব-কাহিনীর সূত্র ধরিয়া প্রচলিত আছে! তবে তাহারা সর্বদা বড় ঘরে মেয়ের বিবাহ দেয়। নিজেদের অপেক্ষা বড় ঘরে কন্যাদান করিয়া কুলমর্যাদা বৃদ্ধি করে তাহারা। 'উঠ্তি ঘরে মেয়ে দেবে, পড়্তি ঘরের মেয়ে আনবে।' এই মতে রায়বাড়ী চলে। সম্পার বড় তিন বোনের নামী ঘরে বিবাহ হইয়াছে। শ্রীলতার বিবাহ হইত দীপঙ্করের সহিত। দীপঙ্করের বংশমর্যাদার প্রয়োজন রায়বাড়ী বোঝে নাই, কারণ পাত্র অতিশয় ধনী। ধন-প্রাচুর্য ছিল পাত্রের মাপকাঠি।

ছায়া পড়্তি ঘরের মেয়ে অন্য দুই জায়ের মত। কিন্তু, তাহার ভাই এরা অবস্থার উন্নতি করিয়াছে চাকুরিক্ষেত্রে উন্নতিতে। ঝর্‌ঝরে মেয়ে ছায়া। ঘর গোছানো, ব্যবস্থানৈপুণ্যে যোড়া নাই। সে বিশ্বাস করে নিরলসভাবে হাতের কাজ করিয়া যাওয়া উন্নতির প্রথম সোপান। অমিয়েন্দ্র অক্লান্ত চেষ্টায় দীপঙ্করের মন যোগাইয়া চলিত। ফলে, আজ দীপঙ্কর এই বৃহৎ পুরস্কার দিয়াছে। ছায়ার ভাইরা কর্ম্মের-জোয়াল অনন্যচিত্তে ঠেলিয়া গিযাছে। তাহারাও সুযোগ পাইয়াছে। সর্বোপরি ছায়া নিজে? বড় জায়ের প্রাধান্য, কট্‌কটে কথা সহ্য করিয়া বাড়ীর এককোণে মুখ বুঁজিয়া ছিল সে। কখনও বিদ্রোহ দেখাইয়া কাঁচা কাজ করিয়া ফেলে নাই। সুদিন তাই আসিয়াছে। বিনা সংগ্রামে, বিনা কলহে দেড়হাজারী চাকুরের স্ত্রীরূপে সংসারে প্রথম স্থান ছায়া লাভ করিয়াছে। জয়া আপনি স্থান-চ্যুতা হইয়াছে। বড় ছেলের স্ত্রী জয়া। স্থবির পিতার দায়িত্ব, সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভার মহেন্দ্রের স্কন্ধে ছিল। পাবনার বাস উঠাইয়া বালিগঞ্জে বাড়ী নির্মাণ করিলেও পাবনার গ্রাম ক'খানির মধ্যেই সঞ্চিত আছে আহার। অন্ন সেখানে। তাই নাগরিক জীবনের শৃংখলার মধ্যে থেকে ছুটিয়া যাইতে হয় পদ্মাপারে। দেখিতে হয় নায়েব ঠিক-মত চালাইতেছে কি না, খাজনা আদায় হইতেছে কি না। এসব কাজ করেন মহেন্দ্র। টাকাকড়ির দিকও দেখেন তিনি। সংসারে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন মহেন্দ্র। স্বামীর গৌরবে গরবিনী জয়া ছিল কর্ত্রী। এখন চাকা উল্টাইয়াছে। জমিদার মহেন্দ্র অপেক্ষা বড় চাকুরে অমিয়েন্দ্র রায়ের প্রতাপ অনেক বেশী। গৃহিনী পর্যন্ত ছায়াকে প্রশ্রয় দেন। মেজ চপলেন্দ্র দুই একটা ছোটখাটো ব্যবসা করেন। এখনও অনিশ্চিত। মহেন্দ্রের এক ছেলে, এক মেয়ে। যা হওয়া উচিত। কিন্তু, চপলেন্দ্রের তিন কন্যা, দুই পুত্র। বিবাহের বারো বছরের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া পিতামহীর অসন্তোষ, জ্যাঠামশায়ের বিরাগ ও মাতাপিতার মনস্তাপ ঘটাইয়াছে। অনেক সন্তান যে দারিদ্র্যের মূল একথা রায়বাড়ীর মত কে জানে? চপলেন্দ্র কোন বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী নয়। রায়বাড়ীর ক্ষীয়মাণ বিষয়ের একমুষ্টি সে চায়। অথচ প্রজননে তাহার কৃতিত্ব রাশিয়ার উপযোগী হইলেও রায়বাড়ী পছন্দ করে নাই। যাই হোক, শেষ সন্তানের জন্মগ্রহণের পরে চপলেন্দ্রের স্ত্রী কলঘরে আছাড় খাইয়া পড়ে। ফলে, সন্তানধারণের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। রায়বাড়ী বাঁচিয়া গেল। বধূর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তাহারা প্রয়োজন বোধ করিল না। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

অমিয়েন্দ্র আধুনিক মতালম্বী। বিবাহের উপহারে বন্ধুদের নিকট হইতে

জন্ম-নিরোধের পুস্তকাবলী পাইয়াছিল। নিজেও ক্রয় করিয়া লইতে ভোলে নাই। তিন বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন বিবাহিত জীবন তাহাকে একটিও সন্তান দেয় নাই।

এখন? হ্যাঁ, অমিয় সখের খেয়ালের মত সন্তানকেও পোষণ করিতে পারে। ছয় মাস কাজ পাইয়াছে সে। ছায়া সম্প্রতি অন্তসত্ত্বা হইয়াছে। অতি গৌরবর্ণ উজ্জ্বলতর হইয়াছে। রুক্ষ চেহারায় লাবণ্য না আসিলেও লাবণ্যের ছায়া নামিয়াছে। তিন বৎসর পরে যেন সে নিজেকে খুঁজিয়া পাইল। এতদিন বড় জায়ের আওতায় থাকিত। এখন নিজমূর্তি ধরিয়াছে। একটু অহঙ্কার দেখি ছায়ার। গৃহিণীর সেবা ও সঙ্গদানের নিমিত্ত সম্প্রতি গৃহিণীর খুড়তুতো ভগ্নিকে এখানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। কদমমণি বিধবা, নিঃসন্তান ও প্রৌঢ়া। ছায়ার চলাফেরা, ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া চোখমুখ উল্টাইয়া গোপনে গ্রাম্য ছড়া কাটেন—

'একে ধলীর ধলা গা,
তাতে ধলী পুতের মা!'

ছায়ার কানে অবশ্য ছড়া পৌঁছে না। তবু, রায়বাড়ীর ছেলে অমিয়। তাহার পত্নীত্বে তিন বৎসর পাকা হইয়াছে ছায়া। এই যৌথ পরিবারে নিজস্ব বলিয়া কিছু রাখা চলে না, তাহা জানে ছায়া। মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু প্রাধান্যটুকু ছায়ার অবশ্য প্রাপ্য। সে ছাড়িতে পারিবে না। গোছালো মেয়ে ছায়া, কাজকর্মে পটু। ঢিলেঢালা চাল আর চলিতে পারে না। খরদৃষ্টি ছায়া তখনই উপস্থিত হয়। কাহাকেও ডাকেনা সে পারত পক্ষে। নিজ হাতে কাজ সারিয়া লয়। হঠাৎ আয় বাড়াতে অধিক ঝি-চাকর আসিয়াছে। ছায়া সমস্ত কাজকর্ম একাই সামলায়। ইহাতে তাহার আনন্দ। সুতরাং ছায়ার সর্দারীতে কেহ আপত্তি করে না। কথায় আছে, যে গরু দুধ দেয়, তাহার লাথিটাও সহ্য করিতে হয়। একজন যদি কাজ করিয়া তৃপ্ত থাকে, আপত্তি কি? হাতে যখন কাজ থাকে না, তখন ছায়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া খোঁজখবর লয় ঠিকভাবে সংসার চলিতেছে কি না। ছায়ার মনে কেমন ধারণা হইয়া গিয়াছিল স্বামী ও সে রায়বাড়ীর হৃতগৌরব প্রত্যর্পণ করিতে ঈশ্বরের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। তা'ছাড়া, লেডিডাক্তার এ অবস্থায় সর্বদা চলাফেরা করিতে বলিয়াছেন। তেইশ বৎসর বয়স হইয়া গিয়াছে তার। 'ছায়া তাই সর্ব-গামিনী।' কারোর কোন কথাবার্তা, কোন আলোচনা নির্জনে হইবার উপায় নাই। তৎক্ষণাৎ ছায়া সেখানে হাজির হইবে, দুইটা মতামত প্রকাশ করিবে। গোটা বাড়ীর কল্যাণ অকল্যাণের ভার যে ছায়াদেবীর উপরে!

সম্প্রীতির পরীক্ষা সামনে। সে ঠিকমত পড়াশোনা করিতেছে কি না সেদিকে ছায়া অযাচিত দৃষ্টি রাখিয়াছে। গরজ যেন ছায়ারই। পরীক্ষা সম্প্রীতি দিবে না, ছায়া যেন দিবে। আজ কলেজের ছুটি আছে। দীর্ঘ দ্বিপ্রহর সম্পা কতটা পড়াশোনা করিল, তদারক করিবার উদ্দেশে ছায়া বেলা দুইটার সময়ে সম্পার ঘরে প্রবেশ করিল।

সম্পার ঘর শ্রীলতার ঘর অপেক্ষা ছোট। বড় বোনের বড় মর্যাদা কি না। আসবাবপত্র সামান্য। একখানা খাট, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, আয়না, আলনা, সেল্‌ফ। অমিয়েন্দ্রের কাছে একখানা রকিং চেয়ারের আবেদন জানাইয়াছে সম্পা। শক্ত চেয়ার, বা লুটানো বিছানায় পড়াশোনা হয় না ঠিকমত। শ্রীলতার নেশা নিজেকে সজ্জিত করা, সম্পার নেশা নিজেকে জ্ঞানী করিয়া তোলা। পড়ার বই বাদে সারা ঘর তাহার বইতে ঢাকা। দীপঙ্কর বহু বই দিয়া গিয়াছে। শ্রীলতার কাছেও অর্থ মেলে, নিজেও হাত-খরচ পাইতেছে। আত্মীয়বন্ধুরা তাহার বাতিক জানিয়া ইংরাজি বাংলা বই উপহার দেয়। অধিকাংশ বই সাহিত্যের।

ছায়া চেয়ারে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। দেহ বর্তমানে স্বাভাবিক প্রথায় স্থূলতর হইয়াছে। সম্পা খাটে জোড়া বালিশে হেলান দিয়া একমনে নভেল পড়িতেছিল। এক নজর দেখিয়া আবার পড়ায় ডুবিয়া গেল। কারণ ছায়ার অযাচিত যাতায়াতে সম্পা অভ্যস্ত।

সম্পার পরিধানে পায়জামা, পাঞ্জাবী। ঘরে একখানা টেবিলপাখা চলে। পাখার বাতাসে তৈলশূন্য চুলগুলি ইতঃস্তত উড়িতেছে। ছায়া সম্পার হাতের বইটির দিকে চোখ রাখিয়া গালে হাত দিল, 'ওমাঃ, তুমি এখন এইসব পড়ছো! আজ বাদে কাল না তোমার পরীক্ষা!'

'আঃ, সেজবৌদি!' সম্পা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার বইয়ের পাতাতে চোখ নামাইল। এ সময়ে বই ছাড়া মুস্কিল। নায়িকা সবেমাত্র প্লেটোনিক প্রেমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন।

'সম্পা, একটু পড়াশোনা করো। সাহিত্যচর্চা তোমার কাল হ'ল। তুমি কি সাহিত্যিক হবে নাকি?'

'হ'তে পারলে তো ভাগ্য মনে করতাম। জগতে তোমরা যাদের সব চেয়ে অপদার্থ, অপ্রয়োজনীয় মনে কর,—আহা, আমি যদি তাদের মত হ'তাম!' এবারে

সম্পা বই ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। রুক্ষ চুল এক হাতে সরাইয়া কবিতায় সুর করিয়া বলিল,—

"We are the music-makers,
We are the dreamers of dreams."

যদি তাই হ'তে পারতাম, ওঃ! গাদা-গাদা বই লিখতাম নিরজনে বসে। তোমাকে করতাম নায়িকা।"

'দরকার নেই। বই লেখা বড় সুখের, না? পাশের বাড়ীর ছেলেটা তো বই লেখে। তবু ঘরদোরের ছিরি কি? ছেঁড়া জামা ঘোচে না। ক'টা পয়সা পায়, শুনি?'

'পয়সাই কি সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড? অবশ্য তোমাদের কাছে তাই। ও ভদ্রলোকের নাম শুনেছি বটে, এখনও বই পড়া হয়নি। এ মাসের টাকা পেলেই একখানা বই ওঁর কিনে ফেলবো।'

ছায়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিল, "হ্যাঁ! ওর বই আবার পয়সা দিয়ে কেনে কেউ।'

সম্পা হাতে চিরুণী লইয়া নির্দয়ভাবে চুলগুলি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল, "পয়সা খরচ করতে আমিও চাইনে, সেজবৌদি। পয়সা আমার নেই। ছেলে-বেলা থেকে 'পয়সা পয়সা' শুনতে শুনতে আমার পয়সায় মমতা হয়েছে প্রচুর। চেনা লোকের ভাল বই কিনে সে পয়সাটার সদ্ব্যবহার না করে অচেনার বই কিনে experiment করতে প্রাণ চায় না। After all, সেটা তো rubbish হতে পারে। যাই হোক, না পড়লেও নয়। আজ পাঁচ মাস হ'ল এসেছেন ভদ্রলোক পাশের বাড়ীতে। তাঁর লেখা একখানা বইও পড়লাম না!'

পূর্ব্ববৎ তাচ্ছিল্যের সহিত ছায়া বলিল, "পয়সা খরচ করে না কিনে কোন লাইব্রেরী থেকে আনলেই হয়।"

সম্পা হতাশায় বলিল, "হ্যাঁ! লাইব্রেরী বলতে তো আমার কলেজ। ফিরিঙ্গি কলেজে ওসব বাংলা বই রাখে না।"

"তোমার সেজদাকে পাড়ার লাইব্রেরীতে পেট্রন করেছে। মাস মাস চাঁদা নেয়। ওখান থেকে আমরা যত ইচ্ছা বই নিতে পারি।"

সম্পা লাফাইয়া উঠিল, "আহা, এতদিন এ কথা বলোনি কেন, বৌদি? তুমি যেন কি একটা! আমি জানলে কত বই পড়ে ফেলতে পারতাম! তা, আজই চাকরকে

দিয়ে শিল্প্ পাঠাও পাশের বাড়ীর গৌতম মুখোপাধ্যায়ের একখানা বই চেয়ে। সন্ধ্যাবেলাই পাবোখন।"

ছায়া নির্লিপ্তভাবে বলিল, 'দেখি। তা, তুমি এখন যে এত বাজে বই পড়ছ, এটা উচিত হচ্ছে না। দু'দিন বাদে পরীক্ষা তোমার। এখন নাটক নভেল ছেড়ে পড়ার বইতে মন দাও। উপন্যাস তোমাকে যোগান হবে না।"

শ্রীলতা অভিমানিনী, শ্রীলতা দাম্ভিকা। শ্রীলতার সহিত এই সুরে এত কথা বলিবার সাধ্য ছায়ার নাই। রায়বাড়ীতে বধূরা কখনো মেয়েদের উপর কর্তৃত্ব করিতে যায় না। মেয়েরা যা ইচ্ছা করে। তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে, কর্ত্রীত্বের লোভে মত্ত ছায়া আজকাল এদিকেও হাত বাড়াইতে ছাড়ে না। সম্পা শ্রীলতা নয়। বয়স হইলেও বালসুলভ চাপল্য আছে সম্পার। তাই, তাহাকে কথা বলা চলে। সম্পাকে চোখে চোখে রাখার আনন্দ পায় ছায়া।

'স্বাধিকার প্রমত্ত' যক্ষের ন্যায় ছায়া অপরাধ করিল। নিমেষে সম্পা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অবশ্য রাগ সম্পার কম। শ্রীলতার ক্রোধের সমান মারাত্মক নয়। তবু, নিজের প্রিয় সখে বাধা পাইয়া সে রাগ করিল।

"দেখ সেজবৌদি, আমার পরীক্ষা আমিই দেব, তুমি তো দেবে না। দিনরাত তোমার অত আমার ওপর নজর রাখা কেন?"

ছায়া বিরক্ত হইল, "একজনের তো সবদিকেই চোখ রাখতে হয়। নইলে গোটা সংসার যে বয়ে যাবে। আমি না হয় সেই কাজটাই করবো। তাতে, তোমার এত ঝাল কেন?"

"ঝাল বা ডালের কথা উঠছে না। আমার দিকে চোখ রাখবার লোক সংসারে তুমি ছাড়া আছে। মা বাবা আছেন, দাদারা আছেন। আমার ওপর কর্ত্রীত্ব, আমি বাড়ীর লোক ছাড়া অন্য পরিবারের লোকের কর্ত্রীত্ব সইবো না।"

ছায়া নিরস্ত হইল। মহেন্দ্র পত্নীর পক্ষে টানিয়া কখনও কথা বলিলেও অমিয় মনেপ্রাণে রায়বাড়ীর ছেলে। পরের বাড়ীর মেয়ে রায়বধূরা। বধূদের কোন কথা ভগিনীদের উপর চলিবে না এ কথা অমিয় স্পষ্ট ভাষায় স্ত্রীকে জানাইয়া দিয়াছে। নিজেরা রায়বাড়ীতে পরস্পরের কাছে দা-কুড়ুল, সাপ-নেউল হোকনা, অন্যের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ। সম্পাকে সন্তুষ্ট করিয়া কথা বলিতে গেল ছায়া। কিন্তু ততক্ষণে সম্পা ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। রায়বাড়ীর মেয়ে সে। নিম্ন-ঘরের ছায়ার সহিত ঝগড়া করিবে না সাধারণ মেয়ের প্রথায়। ঘর হইতে নিজের

বৌদিকে বাহির হইয়া যাইতেও বলিতে সে পারে না। তাই 'স্থান ত্যাগেন দুর্জনঃ' এই উপদেশে অবাঞ্ছিত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার প্রিয় পুস্তক খোলা পড়িয়া রহিল। পাখার বাতাসে পাতাগুলি ওলট-পালট হইতে লাগিল।

ছায়া অপ্রতিভ মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া অবশেষে বইটি বন্ধ করিয়া টেবিলে রাখিল। পাখাটা থামাইয়া দিল। বাহির হইবার প্রাক্কালে তাহার চোখে পড়িল সম্পার বালিশের ওয়াড় অত্যন্ত মলিন। একটু ইতস্তত করিয়া ছায়া ওয়াড় দুইটি খুলিয়া লইল। ধোবা বাড়ীর বাক্সে রাখিয়া নূতন পরিষ্কার ওয়াড় লাগাইতে হইবে।

সকলের দিকে চোখ না রাখিলে ছায়ার চলিবে কেন?

দুই

"দিদি, সেজবৌদির উৎপাতে মারা গেলাম, ভাই।"

বন্ধ ঘরে মুদ্রিত চক্ষে শ্রীলতা শুইয়া ছিল। ঘরের দরজা বন্ধ, অন্ধকার করা। সম্পার উত্তেজিত পদক্ষেপে চোখের পাতা হইতে অলস বাহু তুলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল।

বিছানায় দিদির পাশে বসিয়া সম্পা মুখ খুলিল, "কিন্তু বড় বেড়েছে সেজ-বৌদি। সর্দারীর শেষ নেই। সেজদার কাজ হয়েছে কি না, তাই। সব বুঝি আমি।"

শ্রীলতা ধীরে উত্তর করিল, "তা সম্পা, সেজবৌদি তোমাকে তো ভাল কথাই বলেছেন। তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন? তোমার পড়াশোনার সময় এটা। বাজে বই পড়া কি ভালো? আমাদের অবস্থা ভুলে যাও কেন? তুমি যদি পাশ না করতে পারো, তাহ'লে কতগুলো টাকা নষ্ট হবে? আমাদের নষ্ট করবার টাকা নেই।"

"এখন তো টাকা আসছে অনেক।"

"এ টাকায় কি হ'বে? দেড় হাজার টাকায় কি হ'বে আমাদের? মাসিক আয় অন্ততঃ পাঁচ হাজার বাড়লে তবে চলে, যে ভাবে আমরা থাকতে চাই।"

"তোমার মুখেও 'টাকা টাকা' রব শুনছি। রক্ষে নেই আর। তুমিও শেষ হয়ে গেলে।"

বহুদিন পরে শ্রীলতার ক্ষীণ-অধরের পাশে মাণিক-জ্বলা ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, "টাকার যে কত দরকার এ কথা এতকাল তো তুইই আমাকে শোনাতিস্।"

সম্পা ম্লান হইয়া গেল। মনে পড়িল দীপংকরকে, 'দিদি' ডাকটি। কখন 'মেমসাহেব', কখনও অন্য কোন নামে সস্নেহ পরিহাস। অবাধ হাসি, সরল বাক্য-বিন্যাস, অকাতর ব্যয়। রায়বাড়ীর সংকীর্ণ গণ্ডি ভাঙিয়া দিতে দৈত্য আসিয়াছিল। প্রাচুর্যের দৈত্য। রাজপুত্রীর হতাদরে সে চলিয়া গিয়াছে।

সম্পা ইতস্তত করিয়া বলিল, "একটা কথা। রাগ কোরনা। সত্যি, তাঁর কথা তোমার মনে হয় না?"

"কার কথা?"

"ন্যাকামী কোরনা, দিদি। ভাল করেই জানো কার কথা। তোমার মনে এসেছে শ্রীরাধার ছলনা। বলে দিচ্ছে, তুমি তাঁকে ভালবেসেছ। অবচেতন মনে ছিল ভালবাসা। ঘৃণা রূপ দিয়েছিলে তার। এখন তুমি বুঝতে পেরেছ।"

"নাঃ, সাহিত্য তোমার কাল হ'ল, সম্পা! নভেলী নায়িকার সঙ্গে আমাকে মেলাতে যেয়োনা। ঠকে যাবে।" কঠিনস্বরে শ্রীলতা উত্তর দিল।

সম্পা বেগতিক দেখিয়া কথার মোড় ফিরাইল, "টানাটানি কবে যাবে যে! সব সময় টাকার কথা ভেবে চলা। আর পারিনা। সেজদার রোজগারের টাকায় কি যে লাভ হ'ল?"

"অনেক হয়েছে। গাড়ীর অভাবে লোকসমাজে আমরা বা'র হ'তে পারতাম না। এখন ভাঙা-চোরা হোক সম্পূর্ণ গাড়ীটা আমাদের আছে; সেজদার নূতন গাড়ীটাও পাই। বিনতা, মালতী ভালো স্কুলে পড়ছে। তুমি কিছু পাচ্ছ। আমিও হাতে টাকা পাই। মা'কে মুখ বুজে চুপ করে একা থাকতে হচ্ছে না। কদম-মাসীকে আমরা রাখতে পারছি। ঝি চাকর বেড়েছে। এত হ'ল, তবু দেখতে পাও না?"

"এ আর কি? চিন্তা তো যায়নি। যেদিন সেটা যাবে, সেদিনই সব হ'বে।"

"চিন্তা যায় কি করে? চারটি বোন গলগ্রহ।"

"দিদি, তুমি বিয়ে করো না। বেশ মজা হ'বে।"

"আমি বিয়ে করবো না।"

"কারণ?"

"বিয়ের বয়স আমার গেছে।"

"আহা-হা! সাতাশ বছরে"—

"সাতাশ নয় সম্পা, ঊনত্রিশ। গত মাসে আটাশ পূর্ণ হয়ে গেছে।"

সম্পা স্তব্ধ হইয়া গেল। তরুণী-তন্বী দিদির যৌবন গত প্রায়। রূপকথার রাজকুমারীর মত যে রহস্যাবৃতা, কাল তাহাকেও স্পর্শ করে! সম্পা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। নাঃ, একটি রেখাও তো পড়ে নাই। কমনীয় রূপে কোন মালিন্য নাই। শ্রীলতা যেন আরও রূপসী হইতেছে। কি একটা অভাব ছিল তার? ধীরে ধীরে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

"আমারও বয়স হ'ল, তাহ'লে?"

শ্রীলতা সস্নেহে ভগ্নির পিঠে হাত রাখিল—"আমার চেয়ে অনেক ছোট তুই, সম্পা।"

"তাহলেও তো মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে। যদিও কবি বলেছেন "Grow old along with me, The best is yet to be"—তবু তো সাহস জাগেনা।"

শ্রীলতা জানলার দিকে চাহিয়া উদাস কণ্ঠে বলিল, "তার কারণ আমরা একা। কবিতায় Along with me কথাটা আছে তো।"

সম্পার মনে হইল দীপঙ্করের কথা এক্ষেত্রে তোলা উচিত নয়। দিদির কঠিন স্বরের স্মৃতি এখনো কাণে বাজিতেছে। অথচ, শ্রীলতার কণ্ঠের করুণ সুর অনিবার্য রূপে দীপঙ্করের কথা বলিয়া দেয়। তাড়াতাড়ি কথাটা অন্য খাতে বহাইতে সম্পা চেষ্টা করিল।

"জানো দিদি, বাঁ পাশে ওই গলির ফ্ল্যাট বাড়ীতে কে এসেছে? লেখক গৌতম মুখোপাধ্যায়।"

"তিনি কে?"

শ্রীলতার অজ্ঞতায় সম্পা হাসিল, "আধুনিক যুগের নামকরা লেখক। আমি অবশ্য বই পড়িনি ওঁর। তবে নানা পত্রিকায় যা সমালোচনা দেখেছি বইএর! দুর্দান্ত!"

টেবিলে রক্ষিত বিদেশী পত্রিকাটির প্রতি চাহিয়া শ্রীলতা বলিল, "আমি যা সামান্য পড়ি, তা তো ওইগুলো। দু'একখানা ভাল বাংলা বই দিয়ে যেও আমাকে।"

সম্পা একবার সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিল। তাহার হাত অর্থশূন্য। মাস শেষ হইলে তবে হাতখরচের টাকা পাওয়া যাইবে। দিদির হাতে এখন সব সময় টাকা থাকে। এই সুযোগে গৌতম মুখোপাধ্যায়ের বই কিনিবার টাকা অনায়াসে দিদির কাছ হইতে সংগ্রহ করা চলিত। দিদি তো ভালো বাংলা বই পড়িতে চাহিতেছে। মেজবৌদিকে জব্দ করা চলিত। লম্বা-লম্বা কথা কি ছায়া-বৌদির!

কিন্তু, আজ সম্পা দিদির কাছে কিছু চাহিতে পারিল না। দিদি সুখী নয়। বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। বিকালের ছায়া বাঁপাশে গলিতে মোড়ের গুলমোরের পাতায় পাতায় নামিতেছে। পাতার সবুজ ভেদ করিয়া ফুল ঝরিতেছে অজস্র। বসন্ত আসিতেছে। প্রতিবার সে আসে। চিরন্তন প্রথায় অনেক কিছু আসে! কিন্তু, কতলোকের যে জীবনে বসন্ত চলিয়া গেল, কে হিসাব রাখিবে? শ্রীলতা, তাহার দিদি আজ বড় একা। যাহার অতুলনীয় রূপ ও সংস্কৃতি কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য মধুকর গুঞ্জন করিয়া ফিরিবে, রায়বাড়ীর প্রাচীন গৃহচ্ছায়ায় সে নিসঙ্গ, নিরর্থক দিন যাপন করিতেছে। ভবিষ্যতের অন্ধ গহ্বরে ডুবিয়া যাইতেছে অভিজাত তনয়া শ্রীলতার বর্তমান। শ্রীলতা রায়ের বয়স হইয়াছে।

সম্পার ও দিদির মধ্যে একজন ভ্রাতা আছে। বাঁধাধরা ভাবে পড়াশোনা করেনা বলিয়া এ বাড়ীর ছেলেমেয়ে বয়সে পিছাইয়া থাকে। সম্পার বয়স ঊনিশ। ভ্রাতা বিনয়েন্দ্রের বয়স পঁচিশ। কিন্তু, বিনয় মোটে বি. এস্-সি. ক্লাশে পড়ে। বড় ভাই মহেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন নাই। পিতামহের আদরে, গৃহশিক্ষক পরিবৃত অবস্থায় তিনি বিদ্যা কিয়ৎপরিমাণে লাভ করিলেও, প্রবেশিকা পাশ করেন নাই। কেহ প্রয়োজন বোঝে নাই। তখন জমজমাট অবস্থা রায়বাড়ীর। দ্বিতীয় ভ্রাতা চপলেন্দ্র পিতামহের আমলে পড়িলেন না। আধুনিক শিক্ষার উপযোগিতা বুঝিয়া পিতা চপলেন্দ্রকে স্কুল-কলেজের ছাপে নামাঙ্কিত করিতে চাহিলেন। অতিকষ্টে বাইশ বছর বয়সে চপলেন্দ্র গ্রামের স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া ফেলিলেন। পিতামহ কলিকাতার অবকাশযাপনের নিমিত্ত বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। চপলেন্দ্রকে গ্রামের কুসঙ্গ এড়াইতে কলকাতার বাড়ীতে রাখিয়া কলেজে পড়ানো আরম্ভ হইল। একটি স্থায়ী সংসার গড়িয়া উঠিল। প্রকৃতপক্ষে, ওই সময় হইতে রায়-পরিবার কলিকাতায় স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করে। মহেন্দ্রের স্ত্রী জয়া কলিকাতার মেয়ে। পাড়াগাঁ ভাল লাগে না। ক্রমাগত স্বামীকে সে প্ররোচিত করিতে লাগিল। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। আটাশ বছরের মহেন্দ্র পিতাকে বুঝাইলেন, "ঠাকুর চাকর দারোয়ানের ওপর ভরসা করে চপলকে কলকাতায় রাখাটা ঠিক নয়। জায়গা ভালো নয়।"

পিতা কথার সারমর্ম উপলব্ধি করিলেন। পূর্বপুরুষের প্রমোদাগার ছিল কলিকাতা নগরী। মাঝে মাঝে তাঁহারা দীর্ঘদিনের জন্য বাসা ভাড়া করিয়া লোক-জন লইয়া কলিকাতা বাস করিতে আসিতেন। পরিবারের মহিলাদিগকে আনিতেন

না। বায়ু পরিবর্তন আর কি। কাজেই চপলের পিতা সহজে রাজী হইলেন। জয়াকে বিবাহের পর কলিকাতায় রাখিয়া মেমসাহেবের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ইতিপূর্বে বাড়ীর বধূরা ও মেয়েরা ওইভাবে শিক্ষিত হইত। পিতামহ শ্রীলতার বড় তিনবোন, ললিতা, পার্বতী ও জ্যোতিকে কন্‌ভেন্ট স্কুলে কিছুদিন পড়াইয়া মেমসাহেব নিযুক্ত করিয়া ফিরিঙ্গি শিক্ষার বনেদ পাকা করিয়া যান। ভাগ্যক্রমে কেবলমাত্র বড় নাত্নী ললিতার বিবাহ তিনি দিয়া যাইতে পারেন। তিনি রসিক পুরুষ ছিলেন সাত নাতনীর নাম 'তী', ও 'তা' দিয়া কবিতার মত মিলাইয়া রাখেন—ললিতা, পার্বতী, জ্যোতি, শ্রীলতা, সম্প্রীতি, বিনতা ও মালতী। 'মালতী' নাম তাঁহার দেওয়া নয়। মালতী পুষ্পটিকে তিনি বিকশিত হইতে দেখেন নাই। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নামের মালায় তাঁহার পুত্র, মালতীর বাবা, মালতী নামে গ্রন্থি দিলেন। সর্বকনিষ্ঠা মালতী। 'বুড়ো কর্তার' রসবোধ 'যুবো কর্তার' ছিলনা। 'মালতী' নামটিতে যেন তালভঙ্গ হইল। যে কোন মেয়ের নাম, থিয়েটারের সখী হইতে রাস্তার ঝি পর্যন্ত, 'মালতী' হইতে পারে। রায়বাড়ীর দুহিতা সে এ পরিচয় রূপে থাকিলেও নামে রহিল না। বাড়ীর ছেলেদের নাম রাখা সহজ। কারণ আবহমান কাল হইতে রায় পুরুষের নামের শেষে 'ইন্দ্র' চলিয়া আসিতেছে। ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত ও শাসক-শ্রেণীর লোক তাহারা, এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত সযত্নে যে কোন নামের শেষে 'ইন্দ্র' শব্দটি যোগ করিয়া নামকে দীর্ঘতর করিয়া তাহারা লালন করিতেছে। তাহাদের নাম যথাক্রমেঃ মহেন্দ্র, চপলেন্দ্র, অমিয়েন্দ্র, নিখিলেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র। 'ইন্দ্র' বাদ দিয়া ডাকনাম চলে। 'বুড়ো কর্তার' ছিল দুইটি কন্যা ও মাত্র একটি পুত্র মহেন্দ্রের পিতা সৌরেন্দ্র। জমিদার বাড়ীর ঐতিহ্য বুড়ো কর্তা পর্যন্ত বেশ চলিতেছিল। এক পুত্র কাম্য, এক পুত্র সৌভাগ্যের মূল। কন্যাদের তো বিবাহ দেওয়ার পরে অন্য বাড়ীতে অন্ন মাপিয়া খায়। কিন্তু, পুত্র থাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে। সম্পত্তি বহু পুত্রকে ভাগ করিয়া দিলে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া ছোট হইয়া যায়। তাই একটি পুত্র চাহিয়াছিলেন বুড়ো কর্তা। দুই পুরুষ ধরিয়া তিনি এক পুত্রের ধারা। তাঁহার পুত্র দিয়া তিন পুরুষ একপুত্রের ধারা হইল। বুড়ো কর্তার দুই পুরুষ পূর্বে বহুপুত্রের জন্ম দিয়া রায়-গৃহিণীরা বিশাল সম্পত্তির বিভাগ আনিয়া দুষ্য হইয়াছেন। নইলে, পূর্বপুরুষের 'রাজা' খেতাপ অদ্যাপি রহিত। তবু, বুড়ো কর্তা যতটা বিষয় পাইলেন তাহার বিস্তৃতি বিস্ময়জনক। পিতা বহু পরিমাণে বর্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। বুড়ো কর্তা বিশেষ সৌখীন হইয়া উঠিলেন। গ্রামে বসবাস করিলেও

সম্পন্ন জমিদার হিসাবে রায়বাড়ীর কলিকাতা নগরীর সহিত যোগাযোগ ছিল। রাজপুরুষের মনোরঞ্জন করিতে অনিবার্যরূপে বাড়ীতে সাহেবী কেতার আবির্ভাব হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট-মহিষী, জজ-প্রেয়সীর সহিত মেলামেশা ও কলিকাতার অভিজাত সমাজে প্রবেশের ফলে পরিবারের মহিলারাও মোটামুটি আধুনিক-রুচি-সম্পন্না ছিলেন। রায়-পরিবারের অতীতের দিকে তাকাইলে প্রস্তর-যুগ, লৌহ-যুগ ইত্যাদির ন্যায় কয়েকটি যুগ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম যুগে সাবেকী শিক্ষা। পুরুষ আধুনিক হইলেও মহিলারা পণ্ডিতের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত ভিন্ন ইংরাজি শিক্ষা লইতেন না। পার্টি প্রভৃতিতে তাঁহারা বাহির হইতেন না—পর্দা-নশীন ছিলেন। দ্বিতীয় যুগে সহসা স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখা দিল। রায়বাড়ীর কর্ত্রী অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের অছি হইয়া অকালে মৃত স্বামীর স্থানে সম্পত্তি চালাইতে লাগিলেন। চারিপাশে জ্ঞাতিশত্রু, বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী। বিধবা নিজে সদরে রাজপুরুষদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুত্রের সম্পত্তি রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি অনুভব করিলেন একটি বড় তথ্য। শিক্ষা শক্তি বিশেষ। স্ত্রী-স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী না হইলেও বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োজন। তাঁহার প্রজা মিয়াজান আলি বা দেবেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবারে নারীর শিক্ষা অথবা স্বাধীনতার প্রয়োজন কি? ধান ভানিতে বা রান্না করিতে যতটা বিদ্যা থাকা দরকার, তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়। মধ্যবিত্ত ঘরেও হিসাব রাখিতে বা চিঠি পড়িতে জানা বিদ্যার শেষ মাপকাঠি। 'কিঞ্চিৎ লিখনং বিবাহোরি কারণম্'। ব্যস্। কিবা আছে? ঘটি-বাটী লইয়া মামলা বাধা দুষ্কর। কিন্তু, অভিজাতগৃহে শিক্ষার দরকার। কারণ, ফাঁকি দিয়া সর্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যতমুষ্টি চারিদিকে। শিক্ষাশক্তি নারীকেও অর্জন করিতে হয়। বিধবা ত্রিশ বছর বয়সে নূতন করিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। রাজপুরুষের অনুগ্রহ ব্যতীত গ্রাম্য জমিদারের উপায় নাই। রাজপুরুষের কাছাকাছি থাকা বাঞ্ছনীয়। ম্যাজিষ্ট্রেট্-মহিষী, জজ-প্রেয়সীরা কেহ বিদেশিনী। কেহ স্বদেশিনী হইলেও স্বদেশের সঙ্গে নাড়ী-কাটার পরে আর যোগ নাই। সুতরাং পাবনা শহর হইতে তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীর সহায়তায় এক মিশনারী মেম আমদানী করিয়া বিধবা রায়-বধূ ইংরাজি শিখিতে লাগিলেন। বাসস্থানটি সদরের সন্নিকটে। শহরে ক্রমাগত যাতায়াত চলিল। পিতৃপুরুষের আমলে বৃহৎ বৈঠক-খানার পাশের ঘরে গৃহিনীর নূতন বৈঠকখানা হইল পরদা টানাইয়া ও বিদেশী আসবাব সাজাইয়া। দেওয়ালে বিলিতি ছবি, সোফা-কাউচ, চায়ের ত্রিপদী। রায় পুরুষেরা এ ধরণের ইঙ্গ-বঙ্গ বসিবার ঘরে অভ্যস্ত। কিন্তু, ইতিপূর্বে রায়-

নারীর জন্য এরূপ বৈঠকখানা হয় নাই। সেখানে অনেক পরপুরুষ যাতায়াত করিতে লাগিল। নিন্দায় দেশ ভরিয়া গেল। বিধবা কর্ণপাত করিলেন না। তিনি তীক্ষ্ম বুদ্ধিবলে অনেক বুঝিয়া নিয়াছিলেন। তেমনি বুঝিলেন যে, অভিজাত-পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার পাশাপাশি স্ত্রী-স্বাধীনতা চাই। ঘরে মুখ ঢাকিয়া রান্না করা চলে, বিষয়-রক্ষা হয় না। তিনি আত্মনির্ভরশীল না হইলে নাবালক পুত্র অবশ্য ভাসিয়া যাইত। তখন তাঁহার নিন্দা হইলেও উত্তরাধিকারীগণ শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমে তাঁহার নাম স্মরণ করে। কন্যা-বধূদিগকে তাঁহার তেজ ও দৃঢ়তা অনুসরণ করিতে বলে। তিনি বাড়ীতে ইংরাজি-শিক্ষা চালাইলেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্তন করিলেন। পুত্রবধূকে তিনি অবাধে পুরুষমধ্যে বাহির করিতেন। পাবনা শহরে এ সময়ে একখানা বাগান বাড়ী নির্মাণ করা হয়। পুত্র ও পুত্রবধূর শিক্ষার আশায়। সেখানে বহির্জগতের স্বাদ মিলিত। তারপর কয়েকপুরুষ ধরিয়া মেয়েদের সংস্কৃত-বাংলা শিক্ষার সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষা ও রীতিনীতি চলিতেছে। পর্দাপ্রথাও নাই। ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত শিক্ষা উঠিয়া গেল। মৃত ভাষার চর্চায় অত সময় নষ্ট করে কে? বিশেষতঃ, সাধারণ ঘর হইতে বধূ গ্রহণের ফলে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ হইতেছিল না। অতিকষ্টে সামান্য ইংরাজি লেখাপড়া শেষ করিয়া রায়-নারী শিক্ষায় ইতি দিতে লাগিল। কিন্তু, প্রকৃত শিক্ষা ও ইঙ্গবঙ্গ কায়দা পুরাদমে চালু করিলেন শ্রীলতার পিতামহ বুড়ো কর্তা। কারণও আছে।

বুড়ো কর্তা তখনও বৃদ্ধ হন নাই। কলিকাতায় শীতকালে সার্কাস ও কার্নিভ্যাল দেখিতে বাসাবাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। পাশের বাড়ীর ইঙ্গবঙ্গ মিত্র পরিবারের সহিত ঘনিষ্টতা হইল। মিত্ররা তিন ভাই ব্যারিস্টার। পিতা সিভিল-সার্জেন। মেয়েরা সাহেবী স্কুলে পড়ে, বধূরা গ্রাজুয়েট। গ্রাম্য জমিদারের বড় ভাল লাগিল। তাহারা অতিথি বৎসল, মিশুকে। বিশেষতঃ অতিথিটি আবার বিখ্যাত জমিদার। যাতায়াত, নিমন্ত্রণ চলতে লাগিল। এই আবহাওয়ায় এত ঘনিষ্টভাবে রায়-কর্তা পূর্বে মেশেন নাই। নূতন নেশার ঘোরে তিনি একেবারে ডুবিয়া গেলেন। মিত্র-পরিবারের যাহা দেখেন তাহাই ভালো লাগে। নিজে রাতা-রাতি আধুনিক হইয়া তাহাদের অনুকরণে জীবন-যাত্রা পরিবর্তিত করিলেন। স্বচ্ছল মিত্র-বাড়ী, রোজগার যথেষ্ট। রায়বাড়ীর সঞ্চয় ক্ষয় করিয়া রায়-কর্তা নূতন বড় লোকদের সহিত পাল্লা দিতে লাগিলেন। কলিকাতায় বৃহৎ বাসভবন হইল আধুনিক সাজে সজ্জিত। মিত্র পরিবারের কন্যাদের দেখিয়া নিজের নাত্নীদের স্কুলে দিলেন

পরিবারের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া মোটরগাড়ী কিনিলেন। ঘন ঘন পার্টি দিতে লাগিলেন। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল।

কর্তার বয়স চল্লিশের উর্দ্ধে। পুত্রের বাল্যবিবাহের ফলে নাতি-নাত্নীতে ঘর ভরা। গৃহিনী বুড়ী হইয়া গিয়াছেন। সহসা রায়-কর্তা প্রৌঢ় বয়সে অতি-অসহায়রূপে প্রেমে পড়িলেন। নারী রায়বাড়ীতে সুরার মত আনুসঙ্গিক ছিল। পুরুষ সক্ষম হইলে বহু রমণী সে ভোগ করিতে পারে, এই মত রায়বাড়ীতে প্রচলিত ছিল। অবশ্য অন্যান্য জমিদারদের মত উচ্ছৃংখল তাঁহারা ছিলেন না। আধুনিক শিক্ষার একপত্নীত্ব তাঁহারা বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভূম্যাধিকারীর ভূষণ যেটুকু, তাহা ছাড়া চলে না। সোজা, সহজ জীবন রায়পুরুষের। ভোগের সামগ্রীর ন্যায় নারীকে গ্রহণ কর। পানশেষে শূন্য পাত্র যেমন ত্যজ্য, তেমনি ভোগশেষে নারীকে ত্যাগ কর। সন্তানের জননী, গৃহের মহারাণী গৃহিণীর কাছে ফিরিয়া যাও। তিনি রায়বাড়ীর বধূ, বংশধরের জননী। তাঁহার মর্যাদার যেন হানি না হয়।

এই সহজ মনোবৃত্তিতে কোন মোচড় লাগে নাই এতকাল। রায়পুরুষ প্রেম-ভালবাসা বোঝে না। কবির কাব্য বলিয়া মনে করে। নির্বাচিতা নারীকে বিবাহ, সুলভা নারীকে ভোগ, ইহাই নারী সম্বন্ধে শেষ কথা। কিন্তু বুড়ো কর্তা যে মনে প্রাণে আধুনিক হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ প্রবীণ শেখরেন্দ্র রায়ের ঘাড়ে চাপিল আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভূত—প্রেম। রায়বাড়ীর লৌহ-কঠিন গন্ডি ঠেকাইতে পারিল না। বেহুলার লৌহ-বাসরের ছিদ্র দিয়া সর্প আসিয়া দংশন করিয়া গেল রায়-কর্তাকে।

সে কাহিনী যেমন হৃদয়স্পর্শী তেমনি হাস্যকর। সম্পার কথাটা শেষ করিয়া সেই কাহিনীর অবতারণা করা যাক।

সম্পা দিদির কাছে টাকা চাহিতে পারিল না গৌতম মুখোপাধ্যায়ের বই কিনিতে। দিদির কাছে চাওয়া চলে না—দিদি যে বড় দুঃখী। আটাশ বৎসর দিদির পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ হইল না। এত রূপ বৃথাই গৃহকোটরে নষ্ট হইতেছে। কোথায় রাজকন্যার সয়ম্বর সভা বসিবে, না একমাত্র প্রার্থী দেশত্যাগ করিল। সুতরাং সম্পা দিদিকে অন্যমনস্ক রাখিতে অন্য গল্প আরম্ভ করিল, "আচ্ছা দিদি, ছেলেটার মুখ দেখেছ কোনদিন? বই লেখেন, কিন্তু চোখ নামিয়ে চলাফেরা করেন সব সময়। বাড়ীতে অনেক লোক ওঁর। ভাই বোন গাদা-গাদা। অবস্থা বোধ হয় খুব খারাপ, না? দেখে তোমার তাই মনে হয় না?"

শ্রীলতা শ্রান্তস্বরে বলিল, "এপাশ থেকে ওসব দেখা যায় না। আমি ওকে চোখে দেখিনি কখনো তোদের মুখেই নাম শুনেছি কেবল। এতবড় বাড়ী, কতগুলো ফ্ল্যাট। কত লোক আসে যায়।"

"আচ্ছা দিদি, লেখকদের কি মজা, না? ঘরে বসে একখানা বই লিখলেই সবাই তাকে দেখতে চায়।"

"মজা কি অমজা জিজ্ঞাসা করে নিও তোমার সাহিত্যিক বন্ধুকে। আপাততঃ বিছানা থেকে ওঠো। বাথরুমে যেতে হবে আমাকে।"

সম্পা লাফাইয়া উঠিল, সবেগে প্রতিবাদ করিল, "মোটেই আমার বন্ধু নয়। আমি ওঁকে ভাল করে দেখিনি পর্যন্ত।"

শ্রীলতা ভারী তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া বলিল, "বন্ধুত্ব কি চেনাশোনায় হয় শুধু? ওঁর মতন তোমার সাহিত্যিক মন।" শ্রীলতা অদৃশ্য হইয়া গেল। সম্পা গুণগুণ করিয়া বলিতে বলিতে চলিল,—"We are the music makers, We are the Dreame l s" —

নিজের ঘরে পৌঁছিয়া সম্পা অবাক হইয়া গেল। শ্রীলতার কাছে সে প্রায় একঘণ্টা ছিল। ইতিমধ্যে ছায়া লোক পাঠাইয়া পাড়ার পুস্তকাগার হইতে, একখানা নয়, গৌতম মুখোপাধ্যায়ের তিন-তিনখানা গল্প ও উপন্যাস আনিয়া সম্পার টেবিলে রাখিয়া দিয়েছে। ননদিনীর মনোরঞ্জনের ভেট। নাঃ, সেজবৌদি মোটের উপর বেশ ভালো, এক সর্দারী রোগ ছাড়া।

সম্পা টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া গোগ্রাসে বই গলাধঃকরণ করিতে লাগিল।

তিন

মিত্র-পরিবারে নূতন লোক আসিয়াছে। আমরা মহামান্য স্বর্গীয় কর্তা শেখরেন্দ্র রায়ের সংক্ষিপ্ত প্রেম-জীবন সম্পর্কে আলোচনা করিব। এ আলোচনায় রস আছে রায়বাড়ীর প্রাচীন বনেদে কত বিভিন্ন বীজ ডালপালা বিস্তার করিয়াছে, কত চোরাবালি নিরবচ্ছিন্ন স্রোতোরেখার তলে তলে বহিয়াছে, সে কাহিনী সম্পার গল্পে অপ্রয়োজনীয় হইলেও রায়বাড়ীর গল্পে প্রয়োজনীয়। সুদীর্ঘ-কালের যবনিকা তুলিয়া, আসুন শেখর বাবুর ইতিহাস দেখি।

মিত্র-পরিবারের ভাগ্নী রুচিরা কলিকাতায় আসিয়াছে। বেচারীর বিহারে বিবাহ হইয়াছিল বড় চাকুরের সঙ্গে। সামান্য কয়েকটি বৎসর সে রাণীর গৌরব ভোগ করে। কিন্তু, অকালে স্বামীর মৃত্যু হয়। তিনি যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে রুচিরার সারা জীবন কাটিয়া যাইবে, কিন্তু সন্তানহীনার নিঃসঙ্গ জীবনে শান্তি নাই। রুচিরা শৈশবে পিতৃহীনা, মামার বাড়ীতে প্রতিপালিতা। মা এখনও বাঁচিয়া আছেন। একমাত্র সন্তানের দশা দেখিয়া শয্যা লইলেন। রুচিরা টাকাকড়ি লইয়া মামার বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিল। স্বামীর নিকট আত্মীয় ছিলেন না। রুচিরা বিবাহের পরে এক বৎসর গৃহে পড়িয়া বি-এ পাশ করিয়াছিল। পড়াশোনায় কৃতী ছাত্রী। সাহিত্যবোধ ও সঙ্গীতে জ্ঞান অসাধারণ। পুষ্পভারাক্রান্তা ব্রততীর কমনীয় রূপ রুচিরার। বয়স প্রায় ত্রিশ। সেই সময়ে একান্ত অসহায়ভাবে শেখরেন্দ্র তাহার প্রেমে পড়িলেন।

বসন্তের পরিণাম—রমণীয় সন্ধ্যা। শেখরেন্দ্র মিত্র বাড়ীতে গল্প করিতে ও তাস খেলিতে গিয়াছেন। বসিবার ঘরে পুরুষ, নারীর সমাবেশ যথেষ্ট। মেয়েরা কেহ বা পিয়ানোতে বসিয়া গান গাহিতেছে, কেহ একটা সূচীকার্য হাতে গল্প শুনিতেছে। পুরুষেরা তাসের পাট পাড়িতে পাড়িতে সাহিত্য ও রাজনীতির আলোচনায় মত্ত। শেখরেন্দ্রকে সাদরে সকলে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

"একটি নূতন লোক এসেছে, শেখরবাবু।" এক মিত্র-ভ্রাতা বলিয়া উঠিলেন, "বাবার ভাগ্নী রুচিরা। রুচিরা, ইনিই শেখরেন্দ্র রায়।"

রুচিরা এককোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। রুচিরার মাতা কন্যার বৈধব্যবেশ সহ্য করিতে পারেন নাই। তা'ছাড়া, ও-সমাজে বিধবার থান পরা অবশ্য কর্তব্য ছিল না। রুচিরা কুমারীর বেশে বসিয়া আছে। গলায় সরু এক ছড়া হার, হাতে শাদা দুটি বালা, আঙ্গুলে স্বামীর হীরকাঙ্গুরীয়। পরিধানে চওড়া কালোপাড় সাদা শাড়ী, সাদা আদ্দির পুরো-হাতা জামা। প্রথম দৃষ্টিতে শেখরেন্দ্র মোহিত হইয়া গেলেন। রূপসী তিনি বহু দেখিয়াছেন, পত্নীও অসাধারণ রূপসী ছিলেন। কিন্তু রূপের সঙ্গে এমন শ্রী তিনি কোথাও দেখেন নাই। পুরো-হাতা জামার নীচে হাত দুইখানি যেন কচি পল্লবের সুষমা চুরি করিয়া আনিয়াছে। আরক্ত পদতলে ধরণী পুলকে মূর্চ্ছাগতা। গাত্রবর্ণে গোলাপ ফুটিয়াছে। হরিণীর দৃষ্টি রুচিরার চোখে। সেদিন প্রৌঢ় শেখরেন্দ্র এত কথাই ভাবিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রুচিরার স্বরূপ প্রকাশে আরও মোহিত হইয়া গেলেন।

রুচিরার গান, রুচিরার শিল্পকাজ, রুচিরার হস্তাক্ষর, রুচিরার কথা বলিবার ভঙ্গি শেখরেন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রুচিরার রুচি অনুযায়ী নিজেকে নূতন করিয়া তিনি গঠন করিয়া ফেলিলেন। বাড়ী করিলেন, গাড়ী কিনিলেন। ইঙ্গ-বঙ্গ শিক্ষা গৃহে প্রবর্তিত করিলেন। সহসা একদিন তিনি দেখিলেন তাঁহার সমগ্র জগৎ আবৃত করিয়া রুচিরার মূর্তি। এ কে নারী? ইহাকে তো ভোগশেষে পথের পাশে ফেলিয়া আসা চলে না। এ নারী ভোগ্যবস্তুর পর্যায়ে পড়ে না। রত্নহারের মত ইহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া আজীবন সযত্নে রক্ষা করিতে হয়। শেখরেন্দ্রের সহজ জীবনে প্রকাণ্ড সমস্যা দেখা দিল। গৃহে তিনি প্রবীন ব্যক্তি। বন্যার মত সৌরেন্দ্রের পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিতেছে। দারিদ্র্যের লক্ষণ। অন্যসময়ে তিনি পুত্রবধূর উর্বরতায় বিচলিত হইতেন। কিন্তু ওসময়ে বাহ্য বস্তুতে তাঁহার জ্ঞান ছিল না। জমিদারী দেখাশোনায় দেশে যাওয়া রায়-কর্তা প্রায় ছাড়িয়া দিলেন। পুত্র সৌরেন্দ্র বিষয়-কর্ম তখনো বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহা হইলে কি হয়? নাতি নাত্নীর ঠাকুর্দা, পতিপরায়ণা সতীর প্রৌঢ় স্বামী তো তিনি আর নন। তিনি তখন প্রেমিক। জমিদারী রসাতলে যাক। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" রুচিরা যেখানে, তিনি সেখানে। রুচিরার সহিত দিনান্তে দেখা ও দুইটা কথার আশায় বিষয়-সম্পত্তি জলাঞ্জলি দিতে তিনি পারেন। মিত্র-পরিবারের পাশের ভাড়া বাড়ী হইতে উঠিয়া অল্প দূরে তিনি বিরাট বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল পরিবারস্থ লোকজনও সেখানে আসিয়াছিল। রায়-কর্তা কলিকাতাতেই স্থায়ী বস-বাস করিবেন মনস্থ করিলেন।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে নটবরবেশে রায়-কর্তা গাড়ী চড়িয়া মিত্রবাড়ী উপস্থিত হন। ফেরেন রাত্রি বারোটায়। তারপরে অবসন্ন দেহে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয্যা-শ্রয় নেন। নয়টায় গাত্রোত্থান করিয়া স্বাস্থ্যচর্চা করেন। দেহে বয়সের ছাপ পড়িতেছে। নাত্নীদের পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া পাকা চুল তুলিতে নিযুক্ত করিলেন। গৃহিণী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "আহা, হাঃ! ও শাক-বন কে বেছে শেষ করা যায়? বৃথা চেষ্টা কেন?"

রায়-কর্তা হতাশ হইলেন না। দেহে তাঁর যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ আছে; কিন্তু বংশানুক্রমের ধারায় 'কেশমূলে শমনের থাবা' লাগিয়াছে। রুচিরা ত্রিশের উপরে, কিন্তু একগাছা চুল পাকে নাই। রুচিরা রুচিরাই! কাল রুচিরার কি করিবে? তরুণীর মনোরঞ্জন করিতে প্রৌঢ় শেখরেন্দ্র কলপের সাহায্য নিলেন। সে-কাল হইতে সৌখিনতার স্রোত প্রবাহিত হইল। গরদের জামা, পাম্প-শু, গিলে-করা

ধূতি, আতর, গোলাপজল ছড়াছড়ি যাইতে লাগিল। প্রৌঢ় শেখরেন্দ্র রায় দিগ্বিজয়ে যাইবেন।

কর্তার ভাবগতিক দেখিয়া গৃহিণী শঙ্কিত হইলেন। মিত্র-পরিবারে যাতায়াত ছিল। রুচিরার রুচি, রুচিরার রূপ বলিতে কর্তা তদ্গত। 'বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগে' তাঁহাকে ধরিয়াছে নাকি, গৃহিণী বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তবে রুচিরা মেয়েটি ভালো, অনাচারে হয়ত প্রশ্রয় দিবে না। প্রেম নামক আর একটি বস্তু থাকিলেও রায়-বাড়ীতে প্রেমের চলন বা চালান নাই। সুতরাং শঙ্কার মধ্যেও গৃহিণী ব্যাকুল হইলেন না। ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন।

শেখরেন্দ্র কিন্তু ততদিনে ক্ষেপিয়া গেলেন। প্রথমে রুচিরার মন পাইতে তিনি যে সব প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ক্রমেই নিজের কাছে তাহা হাস্যকর মনে হইতে লাগিল। এ নারীর রুচি এত ঊর্ধ্বে যে তাঁহার পক্ষে নাগাল পাওয়া ভার! ইহাকে কেমন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে? ছলে, বলে, কৌশলে, মোটেই নয়। তবে?

সমগ্র রায়বাড়ীর মান্ধাতা-আমলের শিকড়ে নাড়া লাগিয়া উঠিল। রায়বাড়ীর মর্যাদা, বিধিপদ্ধতি, কঠোর নিয়ম-কানুন অগ্রাহ্য করিয়া সেদিন বেপরোয়া-যৌবন উদ্দামবেগে প্রকাশিত হইল প্রৌঢ় শেখরেন্দ্রের শিরার শোণিত-প্রবাহে। ব্রাহ্মণ জমিদার শেখরেন্দ্র, বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ অভিজাত কুল-তিলক শেখরেন্দ্র, বিগত-যৌবন পিতামহ শেখরেন্দ্র, স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, জাতি-ধর্ম-সম্পত্তি বিসর্জন দিয়া তিনি বিধবা রুচিরা দত্তের পাণিগ্রহণ করিবেন। অবৈধ উপায়ে তাহাকে তো পাওয়া যাইবে না।

রায়বাড়ীতে এমন কথা কেউ শোনে নাই। বিবাহ ভিন্ন নারীকে পুরুষ ভোগ করে অবৈধ উপায়ে। উচ্চশ্রেণীর পুরুষ নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীলোককে রক্ষিতা রাখে। আপত্তি কেউ করে না। কিন্তু, বংশের নাম ডুবাইয়া একজন নিম্নজাতির বিধবাকে বিবাহ কেউ করে নাই, করিতে পারে না। রায়বাড়ী গলা তুলিয়া প্রতিবাদ করিল। কিন্তু, শেখরেন্দ্র তখন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি রায়বাড়ীর কর্তা। ছলচাতুরীর ধার ধারেন না। যাহা তাঁহার প্রয়োজন, তাহা যে তাঁহার চাই-ই, এ কথা প্রকাশ্যে জানাইয়া দিতে কুণ্ঠা নাই।

গৃহিণী প্রায়োপবেশন সুরু করিলেন। সৌরেন্দ্রের স্ত্রী, বর্তমান রায়গৃহিণী শ্বশুরের মুখের উপর কিছু বলিতে সাহস না পাইলেও ভাবেভঙ্গিতে প্রকাশ্য অবজ্ঞা দেখাইতে লাগিলেন। ছেলেমেয়েদের ঠাকুরদা'র কাছে যাওয়া বন্ধ হইল। পঁয়তাল্লিশ বৎসরের বৃদ্ধের তো বরযাত্রা না করিয়া গঙ্গাযাত্রাই করা উচিত। না হইলেও—ক্ষেত্রবিশেষে বাঞ্ছনীয়। সৌরেন্দ্র লজ্জায় দেশ দেখিবার নামে পশ্চিমে পলায়ন করিল।

রুচিরার মা তখন শয্যাগতা। মামা ব্যস্ত থাকেন রোগীপত্র ও তাসখেলা লইয়া। মামাতো ভাই-বোনেরা অতি-আধুনিক। শেখরেন্দ্রের রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তাসপেটা ও গল্প করিবার ছলে সময়-কর্তন কাহারো চোখে বিসদৃশ্য লাগিত না। তাহারা সকলে রাত্রি একটায় শয়ন করিত। সাহেবী মতে সান্ধ্য-ভোজ সাতটায় শেষ হইত। এ বয়সে শেখরেন্দ্র নৈশভোজের অভ্যাস ত্যাগ করিয়া সান্ধ্য-আহারে অভ্যস্ত হইলেন। রুচিরা সর্বক্ষণ না থাকিলেও, তাহার বাসস্থান তো। কাজেই সেখানে বসিয়া সময় কাটানোও সুখকর।

রুচিরা রুগ্ন মাতার শিয়রে বসিয়া ফলের রস পান করাইতেছিল। রোগিনীকে দেখিবার অছিলায় শেখরেন্দ্র সটান প্রবেশ করিলেন। ঘরের লোক তিনি হইয়া গিয়াছেন। প্রৌঢ় বয়স্ক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সর্বত্র দ্বার খোলা।

রুচিরা ফিডিং কাপ হইতে মুখ তুলিল! কোণের ইজিচেয়ারখানাতে শেখরেন্দ্র উপবেশন করিয়া কুশলপ্রশ্নাদি অন্তে তন্ময় দৃষ্টিতে সেবিকার রূপ দেখিতে লাগিলেন। রুচিরার মুখ রাত্রি-জাগরণে মলিন। রুগ্না মাতার অহোরাত্র সেবায় কৃশতনু, কৃশতর হইয়াছে। পরিধানে নীলপাড় শাদা খদ্দর। নিজের হাতে চরকায় কাটা। চুল বাঁধিবার অবকাশ নাই, যদিও ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শেখরেন্দ্র পুনরায় মোহিত হইয়া গেলেন। বিলাসিনী মূর্তি নারীর তিনি দেখিয়াছেন কতবার। কৃচ্ছ্র-সাধনায় এমন মনোহারিণী কাহাকেও দেখেন নাই। বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। আজই রুচিরার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া দরকার। শেখরেন্দ্রের রক্তে দোলা লাগিয়াছে, নিবৃত্তি নাই। যাহা তিনি চান তাহাই পান। এবারেও জয়লক্ষ্মী নিশ্চিত কবলগতা।

শেখরেন্দ্র সুখ-কল্পনায় মগ্ন হইয়া নেলেন। রুচিরাকে লইয়া তিনি বাসা বাঁধিবেন অন্য দেশে। যেখানে কেহ তাঁহাদের চেনে না। রুচিরাকে কোন গ্লানি সহ্য করিতে হইবে না। রুচিরা নিজের রুচিমত ঘর সাজাইবে। শিকারে যে সব ব্যাঘ্র তিনি হত্যা করিয়াছেন, তাহাদের চর্ম রুচিরার পদতলে আস্তৃত করিয়া দিবেন। বঞ্চিতা রুচিরার জীবনে সাফল্য আনিবেন তিনি। তাই তাঁহার অপূর্ণতা রুচিরা ক্ষমা করিতে পারিবে। তিনি বিবাহিত বটে, রুচিরাও তো বিধবা। তিনি প্রৌঢ়, রুচিরাও যুবতী নয়। সবদিকে সামঞ্জস্য আছে। স্থূলকায়া, স্থূলরুচিসম্পন্না পত্নীর আওতায় অকালে বৃদ্ধ হইয়া গেছেন তিনি। মনের খবর গৃহিণী কোনদিন নেন নাই। এখন রুচিরাকে লইয়া নবজীবন তিনি আরম্ভ করিবেন।

মাতা নিদ্রাগতা হইলেন। রুচিরা মাথার শিয়রের নীল আলোটি জ্বালাইয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াইল। শেখরেন্দ্র তাহার পাশে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় জোয়ার লাগিয়াছে। রুচিরা ঊর্ধ্বে চাহিল। কি সুন্দর! চাঁদের আলোতে রুচিরার ঊর্ধ্বমুখী মূর্তি দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিতে দেখিতে শেখরেন্দ্র বলিলেন, "নীচু গলায় একটা গান গাওনা, শুনি।" রুচিরা একবার তাঁহার প্রতি চাহিল। তারপরে গুণগুণ করিয়া গাহিতে লাগিল ঃ—

—"যেফুল না ফুটিতে
ঝ'রেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।
জীবনে যত পূজা হোলনা সারা"—

সংগীতটি মনোমত না হইলেও শেখরেন্দ্র প্রীত হইলেন। অনুরোধমাত্রে রুচিরা গান ধরিয়াছে। মাধবীর উৎসুকতায় আকুল হইয়া আছে রুচিরা। নাও সহকার, আমাকে তুলিয়া নাও। প্রতিদিনের তুচ্ছ কথার মধ্যে, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া যত্নের মধ্যে রুচিরা হৃদয় খুলিয়া দিয়াছে। শেখরেন্দ্র তরুণ যুবকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

"রুচিরা, একটা কথা শুনবে।"

"বলুন।"

তারপরে পনেরো মিনিট ধরিয়া উন্মাদের মত শেখরেন্দ্র যাহা বলিয়া গেলেন, তাহা পরে নিজেরই মনে রহিল না।

ধীরে রুচিরা বলিল, "এধরণের কথা একদিন আপনার মুখ থেকে শুনবো এ কথা আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তবু, বিশ্বাস করতে পারিনি। বড়ই দুঃখিত হলাম।"

শেখরেন্দ্রের মস্তকে যেন নীলাকাশ হইতে বজ্র পড়িল,—"কেন, কেন? দুঃখিত কেন?"

"আপনি না বিবাহিত? আপনার নাতি নাত্নী, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, সবাই আছেন।"

"তাতে কি, রুচিরা? তারা এক জগতে থাকে আমি অন্য জগতে তোমার জীবনে যেমন অপূর্ণতা, আমারও জীবনে তাই।"

"আচ্ছা আপনার কথা থাক। আমি বিধবা, সে কথা ভুললেন কেন?"

"তাইতো চাই তোমাকে, রুচিরা। মাত্র তিনবছর বিয়ে হয়েছিল তোমার, একটা ছেলেমেয়ে পর্যন্ত নেই। সমাজ তোমাকে যা দেয়নি, আমি তোমাকে দেব। তুমি বিধবা? না, না, তুমি কুমারী। বিয়ের নামে যে প্রহসন"—

রুচিরা বাধা দিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল, "প্রহসন? আপনি বোধহয় জানেন না যে বিয়ের আগে আমি আমার স্বমাীকে চিনতাম। নিজে বেছে তাঁকে নিয়েছিলাম।"

শেখরেন্দ্র নিভিয়া গেলেন, তবু অপ্রতিভ লজ্জা চাপা দিতে বলিয়া উঠিলেন, "মাত্র তিন বছর ছিলেন তিনি। তোমার মনে কতটুকু ছাপ পড়েছে আর!"

"তিন বছরটা সামান্য সময় নয়, শেখরবাবু। দিন গুণে কি সময় হিসেব করা চলে? তিন বছর কেন? তিনদিন হ'লেও অন্য কারুকে সে জায়গায় বসানো সম্ভব হ'ত না।"

পরাজিত শেখরেন্দ্র মর্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। একজন বিধবা! সমাজে যাহারা অপাংক্তেয়, তাহাদেরি একজনকে, অভিজাত কুল-তিলক তিনি, বংশ মর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া ধন্য করিতে চাহিলেন। সে তাঁহার সদৃশ ব্যক্তিকে অনায়াসে, অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিল! বিধবার প্রেমে বহুব্যক্তি হাবুডুবু খায়, কিন্তু কয়জনের বিধবাকে প্রকাশ্যে ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিবার সৎসাহস থাকে? অত্যন্ত ভালবাসিয়া ছিলেন বলিয়াই অতি দুর্বলতায় এ বয়সেও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া জীবনব্যাপী গ্লানি তিনি, রায়-বংশের বংশধর, বরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এ ত্যাগ-স্বীকারের কোন মূল্যই রুচিরা দিল না; কৃতার্থ হইয়া গেল না! মান-সম্মান, অর্থ, বংশ, ব্যক্তিত্ব, রূপ, এতগুলির একত্র সমন্বয় যে পুরুষে সে পুরুষ স্বেচ্ছায় সমাজ, স্ত্রীপুত্র বিসর্জন দিয়া লোকাপবাদ চন্দন জ্ঞান করিতে পারে? সেই পুরুষ প্রত্যাখ্যাত হইল গত যৌবনা একজন বিধবার নিকট? বিবাহ-প্রস্তাব বাদ দিয়া বলপ্রয়োগে রুচিরাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেই উচিত হইত। শেখরেন্দ্রের মুখে ক্রুর হাসি দেখা দিল, শিকারী বাজের ধূর্তদৃষ্টি চোখে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই। এ তাঁহার জমিদারী নয়, যেখানে তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এটা নেহাৎ কলিকাতা শহর, যুগটি ইংরেজশাসনের যুগ। শেখরেন্দ্রের মনে হইল যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। যেমন অর্বাচীনের মত তিনি রায়-বাড়ীর মান-সম্ভ্রম ধূলায় লুটাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তেমনি এত বয়সে প্রত্যাখ্যান তাঁহার যথেষ্ট সাজা। কুলদেবতা শাস্তি দিয়াছেন। আবছা ভাবে শেখরেন্দ্র বুঝিলেন, এমন সূক্ষ্মবস্তু পৃথিবীতে আছে যে, স্থূলস্পর্শে ধরা ছোঁয়া যায় না।

শেখরেন্দ্র লজ্জায় অপমানে কলিকাতার বাস উঠাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ব্যর্থপ্রেম তাঁহাকে ম্রিয়মান না করিয়া করিল উগ্র। সুরা ও নারীতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ডুবিয়া রহিলেন। কলিকাতায় অবশ্য যাতায়াত চলিত। নাতি-নাত্নীর শিক্ষা ব্যপদেশে। কিন্তু, মিত্র বাড়ীতে আর কোনদিন পদার্পণ তিনি করেন নাই। মিত্র-ভ্রাতারা বারে বারে সন্ধান করিয়া ব্যর্থ মনোরথে অবশেষে হাল ছাড়িল।

মিত্র বাড়ীর সহিত পাল্লা, অতিবিলাস, শেষ বয়সের লাম্পট্য ইত্যাদি ব্যাপারে শেখরেন্দ্র বিশাল জমিদারী ক্ষয় করিয়া আনিয়াছিলেন। বহু সন্তানের পিতা সৌরেন্দ্রের হাতে যখন বিষয় আসিল, তখন বিশেষ কিছুই আর নাই।

শেখরেন্দ্রের গল্প আমরা প্রধান গল্পাংশ হইতে বিচ্যুত হইয়া এতক্ষণ ধরিয়া বলিলাম, তাহার কারণ আছে। কোন এক সংহত রক্ষণশীল পরিবারের কেহ যখন হঠাৎ বাঁধাধরা ছকে না চলিয়া বেখাপ্পা কিছু করিয়া বসে, তখন আপাতদৃষ্টিতে কার্যকারণ ধরা না পড়িলেও চেতনার অন্তরালে তাহা থাকে। পূর্বপুরুষের শোণিত-ধারা গুপ্তভাবে শিরায় প্রবাহিত। একদিন হয়তো সেই রক্ত বিদ্রোহ করিতে পারে।

চার

না। গৌতম মুখোপাধ্যায়ের লেখা সম্পার ভাল লাগিল না। সে বই তিন-খানি আদ্যন্ত শেষ করিয়া হতাশ হইল। এ লেখার এত প্রশংসা কেন? সমগ্র বইগুলির পটভূমি আচ্ছন্ন করিয়া আছে হতাশা। নৈরাশ্যের চোরা-বালিতে ক্ষণে ক্ষণে পদস্খলন। কেমন একটা অস্বস্তিতে সম্প্রীতি ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভাগ্য-ক্রমে, পয়সা খরচ করিয়া বই সে কেনে নাই। এ বই কাছাকাছি রাখিতেও ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, দূর করিয়া ফেলি। বই-এর কালো মলাট চোখে পড়িলেই মন কালি হইয়া ওঠে। জগতের যত দীনতা-হীনতা ভিড় বাঁধিয়াছে লেখকের প্রতি ছত্রে। গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে মনে পড়িয়া যায় পঠিত বস্তু। মন বিষাক্ত হইয়া ওঠে। সাহিত্য একটা সুন্দর, মহৎ বস্তু। কল্পলোকে প্রয়াণের সোপান, সম্পার মতে। যাহা চাই, অথচ পাই না, তাহারই সন্ধান লেখা থাকে সাহিত্যে। এ কি ছন্নছাড়া, লক্ষ্মী ছাড়া পরিবেশ?

আপদ বিদায়ে ব্যগ্র সম্পা ছায়াকে বইগুলি প্রত্যর্পণ করিল। ছায়া বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "বলি, দুদিনে তিনখানা এত মোটা বই পড়ে ফেল্লে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি তো ভাল লাগলে দু'তিনবার করে এক একখানা বই পড়।"

"তা'হলে বইগুলো ভাল লাগেনি।"

"অথচ, এই বই এর জন্যে ক্ষেপে তো উঠেছিলে।"

"কাগজে কাগজে যা প্রশংসা দেখেছিলাম। ক্ষেপে ওঠা তো স্বাভাবিক। এখন দেখছি সব বাজে কথা। কাগজ-ওয়ালারা যা-তা লেখে না বুঝে।"

কৌতূহলী ছায়া নিজে বই পড়িল। গোটা দুপুরে একখানা শেষ করিল। ফলে, সেদিন বাড়ীর লোকেরা শান্তি পাইল। ছায়ার সর্দ্দারীর অবকাশ কোথায়? বিকালবেলা সম্পাকে ছায়া সকৌতুকে বলিল, "বাবাঃ! ওইটুকু ছেলের পেটে এত? কি জানে, আর কি না জানে! বেশ লিখেছে, কিন্তু। ঐ যে মাঠকোঠার বাসিন্দের কথা লিখেছে, হুবহু ঠিক। আমার বাপের বাড়ীর পাড়ায় একঘর আছে। আমি দেখতাম দিনরাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ঠিক এমনি তারা করতো। কেমন করে লিখলো, ভাই? যেন ছবি এঁকেছে।"

"মাঠকোঠা কি?"

"জানো না? মাঠের মধ্যে দোতালা কাঠের ঘর। ঘরে ঘরে ভাড়াটে। এক জলের কল, এক বাথরুম।"

সম্পা অবাক হইয়া গেল, "কি করে থাকে ওরা? ঘেন্না করে না?"

"করলে কি করবে বলো? গরীব মানুষ। উপায় নেই। তোমরা তো এ ধরণের লোকজন দেখনি। জান না কিছু। তাই তোমার বই ভালো লাগে নি।"

"কেন বড় লোকের কথাও তো আছে? সবই—কেমন যেন!" সম্পা অন্য বিশেষণ পাইল না।

"কি জানি। আমার তো বেশ লাগছে।"

ক্রমে ক্রমে রায়-বাড়ীর অনেকে গৌতম মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়িলেন। কাহারো ভাল লাগিল, কাহারও লাগিল না। তবে, পাশের বাড়ীর ছেলের প্রতি সকলেই মনোযোগী হইয়া উঠিলেন।

বেচারী পাশের বাড়ীর ছেলে! রায়-অট্টালিকার সম্মুখে বড় রাস্তা, ডান পাশে পার্ক। বাঁপাশে সরু গলি, গাড়ী চলে না। সেখানে খানদুই বাড়ী রায়-বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া সেই দিকটা অন্ধকার করিয়াছে। একটি বাড়ী সোনার বেণের।

তাহারা চিক ঝুলাইয়া নিজেদের পর্দা বজায় রাখিয়াছে। অন্য বাড়ীটি ছোট ছোট ফ্ল্যাটে বিভক্ত। নিত্য নূতন ভাড়াটিয়া আসে, যায়। রায়-বাড়ীর নিকটস্থ ফ্ল্যাটে সম্প্রতি গৌতম মুখোপাধ্যায় নামক একজন তরুণ লেখক আসিয়াছে। পাড়ার ক্লাব ও লাইব্রেরীর ছেলেরা অমিয়েন্দ্রকে খবর দিয়াছিল। জলজ্যান্ত একজন লেখক রায়-বাড়ী দেখে নাই। সুতরাং, কৌতূহল প্রথমেই ছিল। বই পড়ার পরে রীতিমত জল্পনা-কল্পনা সুরু হইয়া গেল।

সকালে চায়ের টেবল। ছায়া অভ্যাসানুযায়ী ইহাকে চা, উহাকে টোষ্ট দিয়া নিজের গৃহিণীত্ব বজায় রাখিতেছে। বিনতা বলিয়া উঠিল, "ওই দেখ ছোট্‌দি তোমার গৌতম মুখোপাধ্যায়কে।"

সকলে চোখ তুলিয়া দেখিল—সাধারণ শ্যামবর্ণ একটি ছেলে, অর্ধমলিন ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত, মাথা নামাইয়া এ-ঘর হইতে ও-ঘরে যাইতেছে। চোখে পুরু কাঁচের চশমা ও উচ্ছৃংখল কেশ ভিন্ন কোথাও লেখক বা সাহিত্যিকের পরিচয় নাই। মধ্যম দেহ, দীর্ঘ নয় আবার হ্রস্বও বলা চলে না। স্থূল বা সূক্ষ্ম দুইএর মধ্যে সূক্ষ্মই বলা যায় তাহাকে। লাজুক গোবেচারী বলিয়া মনে হয়। একবাটি দুধ তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিতে মাতৃস্থানীয়াদের মন স্বতঃই ব্যগ্র হইয়া ওঠে।

সম্পা চটিয়া গেল, "আমার মানে? আশ্চর্য! আমি ওঁকে ভাল করে চেয়েই দেখিনি। রাস্তাঘাটে দেখলে চিনতে পারবো না।"

নিখিলেন্দ্র হাসিল, "তাহ'লে, চেনাবার ব্যবস্থা হোক। কি বলুন, সেজবৌদি?"

ছায়া চিন্তিত হইল, "এখন যে সম্পার পরীক্ষার সময়।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। স্ত্রীর মূঢ়তায় বিরক্ত অমিয়েন্দ্র বলিলেন, "সত্যি কি আর গৌতম বাবুকে আনতে বলছে? লোকের মধ্যে বেরিয়ে হয়তো কথাই বলতে পারবে না ও।"

মহেন্দ্র গাম্ভীর্য বজায় রাখিতে ঘরে চা খান। ছায়ার প্রাধান্যের পরে জয়াও স্বামীর সহিত ঘরে বসে। চপলেন্দ্র বহির্গত হইয়াছেন ব্যবসার তাগিদে। তাঁহার স্ত্রী চা খান না। সুতরাং চায়ের টেবলে ছেলে-ছোকরার হাসি-তামাসা চলিয়াছে নিরুপদ্রবে।

সম্পা রাগে অস্থির হইয়া জেলি-মাখানো টোষ্ট্ খণ্ডখণ্ড করিয়া পোষা কুকুরকে দিল। সন্দেশ স্পর্শ করিল না। গরম চা পিরীচে ঢালিয়া সম্পূর্ণ অভদ্র-

ভাবে পান করিল। চটীজুতার ফট্‌ফট্‌ শব্দে—"আমার পড়া আছে। বাজে গল্পের সময় নেই"—কথা ছুঁড়িয়া সে প্রস্থান করিল।

সম্পার পিঠোপিঠি ভ্রাতা বিনয়েন্দ্র। সে হাসিয়া হাততালি দিল, "ওগো সাহিত্যিকা দিদিমণি, সাহিত্যকে অরুচি যে!"

ছায়া সকলের হাস্যপরিহাসে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারিতেছিল না। কি জানি সম্পা আবার কি বলিবে? মুখরা মেয়ে, একবার মুখ খুলিলে রক্ষা নাই। আশ্চর্য মেয়ে সম্পা। বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণ। কখনও সে অতি-পক্ক মুখরা, বুদ্ধিমতী। কখনও অভিমানী বালিকা। কখন যে কোন্‌ ভাব প্রকট হইবে বলা শক্ত। সম্পাকে দেখিলে 'উত্তরা' সম্পর্কে কবি নবীনচন্দ্র সেনের উক্তি মনে পড়ে ঃ—

"এই হাসিরাশি—কুসুম কাননে
কৈশোর-যৌবন করিছে কি রণ?
কহিছে যৌবন—"উত্তরা যুবতী।"
কৈশোর কহে—"না, কিশোরী এখন।"

শ্রীলতা শ্রান্ত চিত্তে ভাবিল, বাজে কথায় ইহারা কালক্ষেপ করে কেন? প্রতি মুহূর্তে জীবন সমাপ্তির মুখে গড়াইয়া চলিতেছে। সেই দুর্লভ মানবজীবনে একটি মুহূর্ত নষ্ট করা চলে না। কিন্তু, করিবার আছে কি? তাহার শৈশব হইতে সে দেখিতেছে সকালের সোনার রৌদ্র এইভাবে এই জানালার লোহার লতাপদ্মে পড়ে। ঢাকা বারান্দায় চায়ের টেবুলে এমনি তাহারা চা-পান করিতে বসে। কতদিন! কতদিন! শ্রীলতার ঊনত্রিশ-বর্ষ জীবনে এমন প্রভাত আসিয়াছে কতবার! কিন্তু, নূতন কিছু আনে নাই। রায়-বাড়ীর গতানুগতিক জীবন বাঁধা পরিখায় প্রবহমান। নূতনের আহ্বান নাই। নূতন আসিলেও স্থানাভাব। লোহার বন্ধনী দিয়া শরীরের বাহুল্য মাংস শাসন করিবার রীতি সভ্যসমাজে প্রচলিত। স্বাভাবিক যাহা, অস্বাভাবিক উপায়ে তাহার নিবৃত্তি। রায়বাড়ীতে ছকের বাহিরের বস্তু অগ্রাহ্য। কালো বার্নিশের চায়ের টেবল ঠিক ওইভাবে বাড়ীর আদিযুগ হইতে রাখা চলিতেছে। একটু সরাইয়া-নড়াইয়া রাখার কথা কেহ বোধ হয় ভাবিতে পারে না। অথচ, টেবলখানা একটু জানালার পাশে সরাইলে এদিকের ঘরটার প্রবেশপথ বিস্তৃততর হয়। কিন্তু, উপায় নাই। প্রথমদিন যখন ও-টেবল ওখানে রাখা হইয়াছিল তখন ওখানেই থাকিবে। কালো হাতীর মত বৃহৎ আলমারীটা জানালার পার্শ্ব হইতে টানিয়া আনিলে দালানটার চেহারা বদলাইয়া যায়। চিন্তাক্লিষ্ট মানুষের চিন্তাবিদূরিত মুখের ন্যায় উজ্জ্বল

হইয়া উঠে। কিন্তু চলিবে না। ঠিক যে ভাবে আছে, চিরকাল তাহা ঠিক সেইভাবে থাকিবে। শ্রীলতা ভাবিল, যদি টিউমার বাহির হয়, তাহা হইলে তো লৌহ-বন্ধনী কাজে লাগে না। রায়-বাড়ীর অঙ্গে অবাঞ্ছিত বিস্তৃতি দূর করা গেলেও টিউমার হইলে কি ঘটিবে?

নিখিলেন্দ্র বংশে প্রথম এম এ পাশ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে তাহাদের পিতা 'যুবো কর্তা' সৌরেন্দ্র রায় ডিগ্রির উপযোগিতা বুঝিয়া পুত্রদিগকে সেইভাবে শিক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রের তখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স ছিল না। মেজ চপলেন্দ্র প্রবেশিকার পরে অতিকষ্টে তিনবারের চেষ্টায় আই-এ গেজেটে নাম তুলিয়া ক্ষান্ত দিলেন। সেজ অমিয়েন্দ্র অবশ্য গ্র্যাজুয়েট হইল। কিন্তু, সাধারণ পাস্-কোর্সে পাশ করার পরে আর পড়াশোনায় অর্থ নষ্ট করিল না সে। সেজ কিন্তু, প্রকৃত বিদ্বান হইল। অর্থনীতিতে এম-এ পাশ করিয়া সম্প্রতি সে ল-কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেছে । বড় ঘরে এমন ছেলে হীরার টুকরো। ছোট বিনয়েন্দ্রকে সে বিজ্ঞান পড়াইল জোর করিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবেশিকা পাশ করার পরে বিনয়কে সে সোজা আই-এস-সি ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া দিল। মহেন্দ্র বলিলেন, "সায়েন্স ও পারবে কেন?" নিখিলেন্দ্র উত্তর দিল, "মেয়েরা যা পারছে, ও ছেলে হয়ে পারবে না?" বিনয় উপস্থিত ছিল। উদ্ধত রায়-বাড়ীর আত্মমর্যাদায় ঘা পড়িল, সে সগর্বে বলিয়া উঠিল, "আমি সায়েন্সই পড়বো।" একবারেই সে আই এস সি পাশ করিয়া বি এস সি পড়িতেছে। নিখিলেন্দ্রের মত ভাল ছাত্র না হইলেও সে অনার্স লইয়াছে। তবে সকলেই তাহারা অধিক বয়সে পাশ করিতেছে। অতি আদরে বাল্যকালে পড়াশোনায় অবহেলার ফলে তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না।

নিখিলেন্দ্র ধীরেসুস্থে বাহির হইয়া গেল। ছায়া চাকর-বাকর দিয়া চায়ের টেবল সাফ করার পর্বে লাগিল। বিনয়, মালতী, বিনতা নানা আলোচনার পরে স্থির করিল পাশের বাড়ীর গো-চোর ছেলেটা ভিজে বিড়াল। দেখিলে মনে হয় ভাজা মাছ উল্টাইতে জানে না। কিন্তু, কলম দেখনা!

সম্পার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। নিষ্কর্মা দিন হাতে। বই পড়িয়া, ঘুমাইয়া কাটে না। ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়। একদিন পাশের বাড়ীর গো-চোরের সহিত আলাপ হইয়া গেল অনিবার্যরূপে। কেমন করিয়া আলাপ হইল বলিয়া লাভ কি? আলাপের পরটাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

জানালা হইতে কথা চলে। আলাপের দুই চারি দিন পরে সম্পা জানালা ধরিয়া বলিল, "আপনার সবশুদ্ধ ক'খানা বই আছে?"

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "একত্রিশখানা।"

সম্পা শিহরিত হইল,—"আপনার বয়স কত?"

"আটাশ পার হয়েছে।"

সম্পা মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, তা, দিদির অপেক্ষা এক বছরের ছোট। দিদি তো একখানাও লিখিতে পারিল না। শুইয়া বসিয়া দিন কাটে ওর। আর, এই পাতলা, কালকোলো ছেলেটি বই লিখিয়া লাইব্রেরী ভরাইয়া ফেলিয়াছে! সম্পা বলিল, "এত বই কি করে লিখলেন?"

"মাথা নীচু করে ক্রমাগত কলম চালিয়ে।"

সম্পা হাসিয়া উঠিল, "আমাকে দু'চারখানা পাঠিয়ে দিননা চাকরের হাতে।"

"আচ্ছা।"

একটু পরে ছোট মেয়ে উপস্থিত হইল খানকয়েক বই হাতে—ঝি বা চাকর নয়। মেয়েটির পরিধানে হাতে সেলাইকরা ফ্রক, চুল পরিপাটি বিন্যস্ত। এ বাড়ী আসিবার উদ্দেশে প্রসাধন বোঝা যায়। কারণ এখনও মুখের আশেপাশে পাউডার-চূর্ণ লাগিয়া আছে। সংকুচিতা মেয়েটি রায়-বাড়ীর ঝি-এর পিছনে সম্পার গৃহদ্বারে দাঁড়াইল।

"কাকা বই পাঠিয়েছেন।"

সম্পা সাগ্রহে তাহাকে আদর করিয়া ঘরে বসাইল।

"গৌতম বাবু তোমার কাকা বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"তোমরা কয়-ভাই বোন? কে কে থাকো এ বাড়ীতে?"

"আমরা ভাইবোন পাঁচজন। এবাড়ীতে থাকি বাবা-মা, দুজন কাকা, তিন পিসিমা।"

সম্পা প্রশ্ন করিয়া গৌতমের পারিবারিক ইতিহাস গৌতমের দশমবর্ষীয়া ভাইঝিএর নিকটে জানিয়া লইল। গৌতমের মা-বাবা উভয়ে বহুদিন গত। একটি বিধবা বোন ও দুইটি অবিবাহিতা বোন। ভাই অফিসে কাজ করেন, ছোটটি পড়ে। বড় ভাইএর পাঁচ পুত্রকন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা এখানে আসিয়াছে। ছোটটি দশমাসের মাত্র। এ পাড়ায় আসিবার পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সম্পা বলিল, "এতদিন এসেছ। কই, কোনদিন আসনি তো? আজ চাকরকে না পাঠিয়ে নিজে এসেছ, ভালো করেছ।"

মেয়েটি বলিল, "আমাদের তো চাকর নেই।"

"সব ঝি বুঝি?"

"ঠিকে ঝি দুবার আসে।"

সম্পা বিস্মিত হইল, "বাড়ীর কাজ করে কে?"

"মা রান্না করেন, পিসিমা বিছানা তোলেন, আমি ঘর ঝাঁট দি। খোকাকে ছোট পিসিমা রাখেন। বড় পিসিমা চা তৈরী করেন।"

এতটুকু মেয়েটি পর্যন্ত কর্মের জোয়াল হইতে মুক্তি পায় নাই। এই ধরণের কোন অনাত্মীয় পরিবারে সম্পা মেশে নাই। সে বলিয়া উঠিল, "একদিন তোমাদের বাড়ী যাবো আমি। তোমার পিসিমাদের সঙ্গে আলাপ করে আসবো।"

মেয়েটির মুখ-চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "কবে যাবেন?"

"পাশাপাশি বাড়ী তো। যাওয়া যাবে যে কোনদিন।"

সম্পার প্রতিশ্রুতি সম্পা ভুলিয়া গেলেও মেয়েটি ভুলিল না। সরু গলায় মাঝে মাঝে ডাকিতে লাগিল, "ও সম্পাদি, এলেন না?"

সম্পা বাধ্য হইয়া মাতার দরবারে আবেদন করিল। নূতন কোন বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি লইতে হইত। তাহারা অনাত্মীয় কাহারও বাড়ীতে যায় না। আত্মীয়দের মধ্যেও স্তর আছে। যাহারা বেশী অন্তরঙ্গ ও নিকট, অর্থাৎ যাহারা রায়-বাড়ীর মন যোগাইয়া চলিতে জানে, তাহাদের সহিত যাতায়াত যথেষ্ট। সমকক্ষদের সহিত নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে মেলামেশা হয়, যদিও পরস্পর পরস্পরের প্রতি অহেতুক ঈর্ষান্বিত। নিম্নস্তরের সহিত দেখা হইলে মাত্র আপ্যায়নে পরিচয় পর্যবসিত প্রায়। তাহারা বিবাহাদিতে নিমন্ত্রণ করিলে একখানা শাড়ী বা অন্য উপহার পাঠাইয়া রায়-বাড়ী, সাধারণতঃ কর্তব্য করে। বাহিরের লোকজনকে রায়-বাড়ী আমল দেয় না। প্রতিবেশীদের সহিত মেশে না। বিশেষ বিবেচনাপূর্বক বাছিয়া বাছিয়া বন্ধুসংখ্যা যোগ করে।

গৌতমদের অবস্থা ভালো নয়, ও বাটীতে পদার্পণ করিবার পূর্বেই সম্পা বুঝিয়াছিল। সবে তাহারা ভাড়াটে ফ্ল্যাটে আসিয়াছে, কোন বিশেষত্ব নাই। এক্ষেত্রে ও বাড়ীতে রায়-দুহিতার গমন অবিশ্বাস্য। তবু আশা গৌতম মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ শক্তিতে। গৌতমকে লইয়া রায়-বাড়ীতে আলোচনা

চলে, তাহার লেখার ভক্ত অনেকে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার কৌতূহল সকলেরই আছে। লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে অমিয়েন্দ্রের ও নিখিলেন্দ্রের সঙ্গে গৌতমের আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। ইতিপূর্বে পাড়ার কোন উৎসব বা প্রতিষ্ঠানের ধার ধারিত না রায়-পুত্রগণ। তাহারা বাহিরে মিশিতে পারিত না, চাহিতও না। অমিয়েন্দ্র বংশে প্রথম চাকুরী করিতেছে। গৃহগত জীবন অন্য ধারা ধরিয়াছে। বাহিরের জগৎ আর তাহার নিকট অস্পৃশ্য নহে । সম্পার সঙ্গে গৌতমের পরিচয় হইয়াছে। কথা চলে, সকলে জানে, সমর্থন করে। কারণ, গৌতম স্বনামধন্য। প্রতিভা রায়-বাড়ীর গণ্ডির মধ্যে ধরা না দিলেও মাঝে মাঝে সীমানাপ্রান্তে দেখা দেয়। যোগ্য মর্যাদা রায়বাড়ী দিবার চেষ্টা করে। ইহা তাহাদের পক্ষে কঠিন কার্য নয়, কারণ, আদিযুগে সভাকবি রাখিবার প্রথা ভূম্যধিকারীরা মানিয়া চলিতেন। গলার মালা খুলিয়া ভূস্বামী কবির গলায় দিতেন। গায়ের শাল দিয়া জমিদার গায়ককে পুরস্কৃত করিতেন। কবি ও শিল্পীকে সম্মান করা মানে উদারতা নয়, নিজের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেওয়া, 'আমি একজন বোদ্ধা', এ বারতা প্রচার করা। তাই গৌতম মুখোপাধ্যায়কে সমাদরের মধ্যে রায়-বাড়ীর নিজেকে সমাদর ছিল। আমি এত ঊর্ধ্বে থাকিয়াও নিম্নের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছি। আমি অর্থ, বংশগৌরব গ্রাহ্য না করিয়া গুণটাকেই গ্রাহ্য করিতেছি। আহা, আমি কি ভাল!

তবু সম্পার প্রস্তাবে রায়-গৃহিণী বিরক্ত হইলেন। চলতি প্রবাদ আছে ঃ "হিন্দু যদি মোছল হয়, গোস্ত্ টানে বেশী।" প্রবাদটি খাস রায়-বাড়ীর দেশ পদ্মাপারের চল্‌তি প্রবাদ। ইতর শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত, তাই গ্রাম্য দোষে দুষ্ট। রায়-গৃহিণী বাড়ীর অন্যান্য বধূর ন্যায় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর হইতে আসিয়াছেন। কিন্তু, দীর্ঘ দিন রায় বাড়ীতে থাকিয়া বংশমর্যাদায় এতই ওয়াকিবহাল হইয়াছেন যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মর্যাদা-জ্ঞান হাস্যকর হইয়া ওঠে।

রায়-গৃহিণী বলিলেন, "ও বাড়ীতে যাবার দরকার তো দেখছি না। তোমরা গৌতম বাবুর লেখা ভালবাসো। তিনি গুণী লোক। তাঁর সঙ্গে মেলা-মেশা কর না। আমি তো নিষেধ করছি না। বিশেষ কোন আলোচনা করতে চাও তো একদিন গৌতমবাবুকে নেমন্তন্ন কর।"

সম্পা ক্রুদ্ধ হইল, "গৌতমবাবুর সঙ্গে আমার কোন আলোচনা নেই। সে জন্যে আমি যেতে চাইছি না। তাঁর ভাইঝি সেদিন এসেছিল। রোজ রোজ যেতে বলে বিশেষ করে। আজ্ যাব ভাবছি।"

"ওঁর ভাইঝি তোমার বয়সী নয়, যে সে এলেই ফির্তি যেতে হবে। বাড়ীর অন্য কোন মেয়েরা তো আসেন নি।"

"কি করে আসবেন? আমরা কি আসতে বলেছি, না ডেকে কথা কয়েছি? ওঁরা আমাদের চেয়ে অনেক গরীব নিশ্চয়। আমাদের ধরণ ধারণ দেখে সাহস করেন না। আমরা তো সারা জীবনটা নিজেদের নিয়ে কাটালাম। তাতে লাভ হ'ল কিছু?"

মুখরার বাক্যবিন্যাসে গৃহিণীর ভয় আছে। তাড়াতাড়ি তিনি বলিলেন, "অত কথায় কাজ কি? নেহাৎ যেতে চাও তো যেতে পার। কিন্তু বেশীক্ষণ থেকো না বা কিছু খেয়ো না। কোনদিন আমরা কোথাও যাই না. তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি আছে।"

"কোনদিন যা করিনি, আজও তাই চালাব? কোনদিন তো কেউ এ বাড়ীতে চাক্‌রী করেনি। সেজদা এখন করছে কেন?" সম্পা প্রকান্ড খোঁচাটা দিয়া অদৃশ্য হইল।

মাতার নির্দেশ সম্পা পালন করে নাই। গৌতমের বাড়ী সে ছিল যথেষ্ট সময়। চা-লুচি-ভাজা-মিষ্টান্ন গোগ্রাসে ভক্ষণ করিয়াছিল। ছোট তিনটি ঘর, রান্নাঘর। রান্নাঘরের এক পার্শ্বে সংক্ষিপ্ত নিরামিষ রান্নার ব্যবস্থা বিধবার। গৃহিণীর ঘরের তাকেই ভাঁড়ার। পাঁচ ছেলেমেয়ে সমেত স্বামী-স্ত্রী ছোট একখানা ঘরে শুইয়া থাকেন। ঘরে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র সজ্জিত। যথা ঃ বিভিন্ন আকারের ভাঁড় ও শিশি, বাক্স, বাসনপত্র। অন্য ঘরে তিন পিসির বিছানা, চাল-ডালের জালা। কোণের ঘরখানা সারাদিন গৌতম একা ভোগ করে। বাধ্য হইয়া তাহাকে ঘরের দখলী-স্বত্ব দিতে হইয়াছে। রাত্রে ছোট ভাই সেখানে শোয়। গৌতমকে ছোট বাড়ীতে আস্ত একটি ঘর দিতেই হয়। কারণ সে লেখক।

গৌতম বাড়ী ছিল না। সম্পাকে সকলে খাতির করিয়া সেই ঘরে বসাইল। বসিবার ঘর বলিয়া বাড়ীতে পৃথক গৃহ নাই। গৌতমের ঘরখানা আবর্জনাশূন্য। গৌতমের কাছে সব সময় বাহিরের লোকের যে আসা লাগিয়া আছে।

গৌতমের ঘরে একখানা টেবল, চারখানা চেয়ার আছে। কৌতূহলী সম্পা চারিদিক খুঁটিয়া দেখিল। একটা কাঠের আলমারী, গোটা দুই সেল্প আছে। একখানা ছোট নীচু চৌকি সুজনী দ্বারা আবৃত। দেওয়ালে একটা জাপানী ঘড়ি। কয়খানা ছবি। আর আছে বই—অসংখ্য। সেল্পে, টেবিলে, আলমারীর মাথায়

—সর্বত্র। এককোণে পরদা-ঢাকা একটু জায়গা। সম্পা গোপনে উঁকি দিয়া দেখিল একটা আলনায় কয়েকটি কাপড়-জামা ও একজোড়া চটী, একজোড়া কাবুলী স্যাণ্ডেল। গৌতমের রুচিবোধ বোঝা যায়। প্রকাশ্যে নগ্ন অবস্থায় বেশবাস ত্যাগ বর্জনার্থে সে এ ব্যবস্থা করিয়াছে।

বাড়ীর সকলের মতে ঘরটি বিশেষরূপে সজ্জিত। গৌতমের ঘর বাড়ীর গৌরব। তাই বড়লোকের মেয়ে সম্পাকে তাহারা সেই ঘরে বসাইল। পিসিরা চা করিল, লুচি ভাজিল, বাজার হইতে মিষ্টান্ন কিনিল। তোলা সসার-কাপ বাহির করিয়া সযত্নে সম্পার সম্মুখে খাবার দিল। ততক্ষণে সম্পা ঘরের মেয়ে হইয়া গিয়াছে। মাতার নিষেধ সম্পার মনেও নাই। ছোট পিসির রবীন্দ্র-সংগীত শুনিতে তন্ময় সম্পা খাবারের থালা কখন শেষ করিয়া ফেলিল জানে না। সম্পার চমৎকার লাগিতেছিল। এমন পরিবেশে পূর্বে আসে নাই। তাহার গরীব আত্মীয়ের অভাব নাই—ছোট গলিতে একখানা দু'খানা ঘরে কুকুর-বিড়ালের জীবন যাপন করে। কদাচিৎ কালেভদ্রে দেখা সাক্ষাৎ হয়। যদি তাহাদের বাড়ী যাওয়া যায় তাহা হইলে সাহায্য উদ্দেশে পুরাতন কাপড়-জামা, গরম কাপড়ের বাড়তি টুকরা, খাদ্যবস্তু সংগে যায়। যেটুকু সময় থাকিতে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া যায়। কোনমতে জঘন্য পরিবেশ হইতে মুক্তি পাইলে শান্তি। সে দারিদ্র্য যেন শিলার মত বুকে চাপিয়া বসে। নিশ্ছিদ্র অটুট গ্রাসে শিকার কবলিত করিয়াছে। চারি পাশ হইতে তমসার ঘোরে উঠিয়া আসিতেছে অভাববোধ, নৈরাশ্য। সে সর্বহারা দারিদ্র্যের কাছে রায়-বাড়ীর 'টাকা বেশী নাই' গোছের অস্বচ্ছলতা বিলাস প্রতীয়মান হয়। হাড়গোড়-বার-করা বাড়ীর শ্রীহীনতা কেবলমাত্র সেই দারিদ্র্যের সংগে তুলনীয়। রায়-বাড়ী তত অভাব সহ্য করিতে পারে না। তাই সেখানে সহজে যাওয়া হয় না। গৌতমদের দারিদ্র্যের রূপ ভিন্ন। তাহারা যে দরিদ্র এ তথ্য পদার্পণ মাত্রে বোধগম্য হয়। যথেষ্ট দরিদ্র। দারিদ্র্য এত অধিক যে সম্যক আবরণ সম্ভবপর নহে। তবু সর্বহারা রূপ নাই এ দারিদ্র্যের; করুণ বিষণ্ণতা আছে শুধু। অভাব ঢাকা পড়িয়াছে সহজ জীবনযাত্রার সারল্যে। অর্থহীনতা ঢাকিয়াছে শিল্পকলাবোধ। বাঙালীর মজ্জাগত ভদ্র জীবন আদর্শ ও সংস্কৃতি জ্ঞান পালিশ দিয়াছে হাড়গোড় বাহির করা গরিবিয়ানায়। এখানে আছে গৌতমের কলম, গৌতমের ছোট বোন অনুজার কণ্ঠ, বিধবা বড়দিদির হাতের সূচীশিল্প, ভ্রাতৃজায়ার পরিচ্ছন্নতা, শিশুদের ভদ্র ব্যবহার। তিনখানি ঘর মাত্র। রায়-গৃহিণীর শয়ন-কক্ষে এদের সম্পূর্ণ বাড়ীখানি ভর্তি করা চলে। কোন জায়গায় বাহুল্য নাই।

পাঁচটি শিশু নোংরা করিতে পারে নাই। গৌতমের সিমেণ্টের শাদা মেজে আয়নার সাদৃশ্য ধরিয়াছে। ঘরে ধূলি-বালির লেশ নাই। মেয়েদের শাদা র‍্যাশনের শাড়ী শাদাই আছে। দশ মাসের বাচ্চাটি পর্যন্ত নগ্নগাত্র নয়। সম্পার ভাল লাগিল। নূতনত্ব-প্রয়াসী মন তাহার—শিল্পীর মন। সাহিত্য সম্পার জীবন-বেদ। বিচিত্র পরিবেশ নিজ্ জীবনের একঘেয়েমি হইতে যে মুক্তি আনিয়া দিল, তাহার স্বাদ অপূর্ব। সর্বোপরি পুতুলের ঘরের মত ছোট তিনখানি ঘর ও বারান্দা ভরিয়া যে সংস্কৃতির আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে, তাহা সম্পার লোভী ব্যগ্রতায় পান করিতে সাধ হইল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিল সম্পা নূতন ভাবে বিভোর হইয়া। অনুজার গান তখনও কাণে বাজিতেছিল ঃ "একটু কেবল বসতে দিও কাছে"—জগতে কোন কোন মানুষের চাহিদা কত কম থাকে? কবি পাশে বসিয়া তৃপ্ত। গৌতমেরা রসগোল্লার ভাঁড়ের মত ছোট ঘুপচি বাড়ীতে সুখে থাকে। বেশী চাহিয়াই লোকের অতৃপ্তির জ্বালা। অধিক আড়ম্বরেই অভাব। রায়-বাড়ী নিজের চারিপাশে এত জঞ্জাল জড় করিয়াছে যে জীবনকে পর্যন্ত ঢাকিয়া দিয়াছে।

বিনতা লাফাইয়া আসিল, "সব দেখেছি আমরা। মালতী আর আমি ছাদের কোণে দাঁড়িয়েছিলাম। ওখান থেকে গৌতমবাবুর ঘর স্পষ্ট দেখা যায়। উঃ. ছোর্টদি, কি খাওয়াটা খেলে! গাদা গাদা লুচি, এত এত বেগুন-ভাজা, দশ-বারোটা রসগোল্লা"—

সম্পা শঙ্কিত হইয়া বাধা দিল, "চুপ, চেঁচাস না! মা শুনলে বকবেন। আমি তো অল্প খেয়েছি। মোটেই দশ বারোটা রসগোল্লা দেয়নি।"

মালতী সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কেমন লোক ওরা? মেয়েটা কি সুন্দর গান গায়, না? আচ্ছা, আমাদের নিয়ে যেতে বলেনি?"

দোতলার বারান্দা হইতে মাতার রাশভারী কণ্ঠ শোনা গেল, "সম্পা, এখানে এস।" সম্পা উপরে উঠিয়া গেল। মালতী-বিনতা দু'এক সিঁড়ি নীচে অপেক্ষা করিতে লাগিল। একটা নূতন জায়গায় বেচারী ছোড়দি যদি বা মজা করিয়া আসিল, এখন মাতার তিরস্কারে সুদে আসলে মজা উঠিয়া যায় বুঝি।

মা বিশেষ তিরস্কার করিলেন না, কন্যার মেজাজ জানা ছিল তাঁর। শুধু বলিলেন, "এত দেরী করলে কেন? তাঁদের তো অন্য কাজকর্ম থাকতে পারে। প্রথমদিনে এত হ্যাংলামি ভাল নয়। আর, খেলে কেন? এখন একদিন তো ওঁদের ডেকে খাওয়াতে হবে।"

পাঁচ

গৌতমের ঘরখানাতে সম্পা বসিয়া গল্প করিতেছে। প্রথম দিনের পরে মাস ছয়েক হইয়া গেছে। এখন দুই বাড়ীতেই অসমান অবস্থা সত্ত্বেও আলাপ অন্তরঙ্গ। সম্পা ও-বাড়ীতে আহার্য গ্রহণ করিয়াছিল। অগত্যা, ও-বাড়ীর সাধারণ মধ্যবিত্ত বাসিন্দাদিগকে একদিন চায়ে ডাকা আবশ্যক হইল; গৃহিণী দেখিলেন তাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষায় ন্যূন নহে। রায়বাড়ীর ছেলেমেয়ে অর্থাৎ গৃহিণীর নাতি-নাত্নী অপেক্ষা তারা সভ্য। খাওয়ার সময়ে লোলুপতা প্রকাশ করিলেও কোন জিনিস-পত্রে হাত দেওয়া বা অসভ্যতা করা জানে না। অনুজা বিনতার বয়সী অর্থাৎ ষোল। গত বছর এরি মধ্যে প্রবেশিকা পাশ করিয়া ফেলিয়াছে। গানের গলাটিও বিনা শিক্ষায় অতি চমৎকার। গৌতমের দ্বিতীয় ভগ্নী সম্পার চেয়ে দুই বছরের বড়। সে-ও বি. এ. পাশ করিয়া বাড়ীতে বাংলায় এম. এ. পড়িতেছে। শুধু মেয়েরা শিশুসহ আসিয়াছিলেন। গৃহিণী শুনিলেন গৌতমের ছোট ভাই বি. এ. পাশ করিয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার বয়স মাত্র আঠারো। আটাশ বছরে গৌতম একত্রিশখানা বই লিখিয়াছে, অসংখ্য বক্তৃতা দিয়াছে, ভারতবর্ষের সমস্ত কাগজে লিখিয়াছে, নানা ভাষা শিখিয়াছে। ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "এর ভাই-এরা সকলেই বৃত্তি পেয়ে পেয়ে পড়াশোনা চালিয়েছে।"

রায়-গৃহিণী নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য-আভিজাত্য কিছুই যেন তাঁহার সাধারণবুদ্ধি সন্তানদের এই আশ্চর্য পরিবারের সমকক্ষ করিল না। মনে হইল, শুধু বংশ বা অর্থে ফল কি? রায়-নাতি-নাত্নী অপ্রতিভভাবে চুপ করিয়া সমবয়স্ক বাচ্চাদের নাচ-গান-আবৃত্তি দেখিল। এ ধরণের কোন শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই—ব্যুৎপত্তিও নাই। গরীব-ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছে —তাহারা একেবারে নিভিয়া গেল।

আহারের আয়োজন প্রচুর। 'জামাইষষ্ঠীর' বিগতস্মৃতি বিগতই। এখন রায়-বাড়ীতে অর্থ আছে। যুদ্ধের সে মহার্ঘ বাজারও চলিয়া গিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হওয়াতে খাজনা-পত্র আদায় হয়। তাই রায়-বাড়ীর উপযুক্ত রসদ এখন পাওয়া যায়।

মাংসের সিঙ্গারা, মাছের কচুরী, রাধাবল্লভী, ছানার পায়েস ইত্যাদি দেখিয়া বাচ্চাগুলির চোখমুখ জ্বলজ্বলে হইয়া উঠিল। তাহারা অবশ্য মুখে কোন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিল না। সম্মুখে প্লেট লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু, খাবার পাতে পড়িতে না পড়িতে অদৃশ্য। কেহ বা হাত-পাত চাটিতে সুরু করিল। মা ও পিসীদের ভ্রূভঙ্গিতে সংযত হইবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইলেও তাহারা লোলুপ, ইহা বোঝা গেল। এই দিকে তাহাদের চারিত্রিক নিকৃষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। রায়-গৃহিণীর অধরে সূক্ষ্ম হাসি দেখা দিল। জয়া ও ছায়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া পরিবেশন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সম্পা একটু অপ্রতিভ হইল। যেন লোকগুলির ভালমন্দ ব্যবহারের জন্য দায়ী সে নিজে। সে-ই বলিতে গেলে এ বাড়ী তাহাদের আনিয়াছে। মনে মনে বিরক্ত হইয়া সম্পা ভাবিল, যাহারা অন্য সব দিকে এত শিক্ষা পাইয়াছে তাহদের এ দিকের আদব-কায়দা আব একটু শিখাইলেই ভাল হইত। একসঙ্গে গোটা খাবারটা মুখে পুরিতেছে, দেখ। আবার একটু একটু করিয়া কেহ বা কৃপণের মত খাদ্য গ্রহণ করিতেছে। যদি ফুরাইয়া যায়। খায়ও পরিমাণে ঢের। বাচ্চাদের খাওয়া দেখিতে অনেকে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগিলেন। রায়-গৃহিণীর বিধবা খুড়তুতো বোন চোখমুখ উল্টাইয়া বলিলেন, "আহার দেখলেই বোঝা যায় কোন্ ঘরের। লক্ষ্মীমন্তের বাড়ীর ছেলে-মেয়ে এই এতটুকুনি খায়।" সম্পা ঘরে গিয়াছিল ছবির বই আনিতে, বাচ্চাদের দেখাইবার উদ্দেশ্যে। শুনাইয়া দিল, "আহাহা, আমরা ঠিক-ই এতটুকুনি খাই বইকি!"

বাচ্চাদের আহার হাসির খোরাক যোগাইলেও মোটামুটি সন্ধ্যাটি ভাল কাটিয়াছিল। পাশের বাড়ীর লোকেদের সহিত মেলামেশার পরে গৃহিণী রায় প্রকাশ করিলেন যে তাহাদের সহিত মেলামেশা চলিবে। এমন কি, নিজের সাত নাতি-নাত্নিকে মুখোপাধ্যায় বাড়ীর ছেলেমেয়েদের অনুকরণে পড়াশোনায় মনোযোগ, কলাবিদ্যায় অনুরাগী হইতে নির্দেশ দিলেন। দুই বাড়ীতে আলাপ-পরিচয় গাঢ়তর হইতে লাগিল।

আজ তাই অবাধে সম্পা গৌতমের ছোট ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছে। আলোচনার বস্তু সাহিত্য। ঘরের আবহাওয়ায় সম্পা অনুভব করে যেন সে সাহিত্য-মার্গে প্রতি মুহূর্তে উন্নীত হইয়া যাইতেছে। টেবিলে ব্লটিংপ্যাডে লেখার ছাপ, দুইটি ঝরণা-কলম, কালির দোয়াত। অসমাপ্ত, অর্ধ সমাপ্ত লেখায় গৌতমের ডেস্ক পরিপূর্ণ।

"আচ্ছা, একসঙ্গে দু'তিনখানা বই লেখেন কি করে? আপনার লেখা তো পড়ে দেখেছি এটা-ওটায় মিল নেই।"

"লিখতেই হয়।"

"কেন?"

গৌতম অসহিষ্ণুভাবে নড়িয়া বসিল, "আমাদের সঙ্গে এতদিন আলাপ হয়েছে। এখনও কি বুঝতে পারছেন না কেন আমাকে ক্রমাগত লিখে যেতে হয়।" সম্পা বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গৌতম একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "কারণ, আমাদের অভাব। দাদা সামান্য মাইনে পান। এতবড় পরিবারের তো খাওয়া-পরা আছে। ছোটভাই এখনও মানুষ হয়নি।"

মানুষ যে এত সহজে, অনায়াসে নিজের দারিদ্র্যের কথা ব্যক্ত করিতে পারে তাহা সম্পার জানা ছিল না! সম্পা স্তম্ভিত হইয়া গেল। রায়-বাড়ীর ঐতিহ্য ছিন্ন-কন্থা-সীবন দ্বারা গলদ ঢাকা। অর্থ না থাকিলেও অর্থের খোলস পরা। সম্পা ভাবিত, সত্যই যদি টাকা গাঁথিয়া পোষাক তৈরি করা চলিত, রায়-বাড়ী অনাহারে থাকিয়াও টাকা গাঁথিয়া বেশভূষা নির্মাণ করিত। পরিয়া বেড়াইত। প্রতি পদক্ষেপে শব্দ উঠিত ঝন্-ঝন্। বিটোফেনের সোনাটার সুললিত সুর যেন সে ধ্বনিতে রায়-বাড়ী খুঁজিয়া পাইত।

"শুধু লেখার আনন্দে লেখেন না কখনো?"

"ভুল মিস্ রায়, সম্পূর্ণ ভুল। লেখার আনন্দে কেউ লেখে না। লেখে— কবিতা, দু'একটি সুন্দর গল্প, একখানা প্রেমের উপন্যাস। জ্ঞানীজন এক আধটা সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু, এই অজস্র pot-boiler কেউ লেখে না। ক্রমাগত নীরস গদ্যের সুতোয় গল্প বলা। আমার তো চোখে জল আসে। মনে হয়, না হয়, অফিসে কেরাণীগিরি করি। সে-ও তো এর চেয়ে ভালো। কিন্তু, লিখে আমি বেশী রোজগার করতে পারছি। আমাকে কে কাজ দেবে? কোন মতে বি. এ. পাশ করে আমি অর্থাভাবে পড়তে পারিনি। বাবা সবে মারা গেছেন। দাদার ওই মেয়েটা হয়েছে। দাদা ভাল কাজ পাননি। আগেই দু'তিনখানা বই লিখেছিলাম। কাট্তি হয়েছিল। আর একখানা অর্ধেক লেখা হয়েছিল। সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করলাম। কিছু টাকা পেলাম। সেই প্রকাশকই আরো বায়না দিলেন। লেগে গেলাম এই কাজে চোখ কান বুজে। দশ বছরে পঁচিশখানা বই বেরিয়েছে। সতেরোখানা উপন্যাস, আটখানা গল্প। আপনার সঙ্গে আলাপের পরে একখানা উপন্যাস বেরিয়েছে। একখানা ছোট গল্পের বই সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু, সত্যি বলছি, ভাল লাগে না।"

সম্পা দ্বিতীয়বার শক্ পাইল। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে মনে মোলায়েম ধারণা ছিল। সেই কবিতাটা?

"We are the Music makers,
We are the Dreamers of Dreams!"

ঝক্‌ঝকে সুদৃশ্য বাঁধানো বই। কত মহত্ত্ব, কত সৌন্দর্যের কথা থাকে! কত স্বপ্ন-দিয়ে গড়া কাহিনী! কিন্তু যাঁরা রচনা করেন, সত্যই কি তাঁদের এতটাই খারাপ লাগে?

সম্পা তাড়াতাড়ি নৈরাশ্যবাদী সুর এড়াইবার আশায় প্রশ্ন করিল, "তবে অনেক টাকা পাওয়া যায়, না? লিখে ফেল্লেই হ'ল।"

গৌতমের দীর্ঘ নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, "মোটেই না। নিজে যখন প্রকাশক নই, তখন অন্যের দ্বারস্থ হ'তে হয়। আমার বই থেকে তারা লাভ করে হাজার টাকা, আমাকে দেয় দুশো। তা-ও অনুগ্রহের ভাবে?"

"এত কম? বই তো আপনি লিখেছেন। আপনার তো জিনিস।"

"ওই তো মজা। একখানা বই ছাপাতে বিস্তর খরচ। তারপরে দেখাশোনা, হিসাব-পত্র রাখা আছে। বিজ্ঞাপন দিতে হয়। বিক্রি করতে হয়। সাহিত্যিকেরা এত সব কাজ করে উঠতে পারেন না। সে সময় তাঁদের নেই, সে ব্যবসাবুদ্ধিও দুর্লভ। তা'ছাড়া, টাকা কোথায়? তাই প্রকাশক শ্রেণী নামে একদল জীব আজকাল করে খাচ্ছেন। বাড়ী-গাড়ী তাঁরা করে ফেলেছেন, অথচ আমরা অনেক সময় ট্রাম-বাসের পয়সা পকেটে পাই না।"

সম্পা অবাক হইয়া শুনিতেছিল, "প্রকাশকেরা কি ভালো লোক নন?"

"লেখক বিশেষে তাঁরা ভাল বা মন্দ। যদি আমি সর্বপ্রধান বিক্রেতার লেখক হই, আমার কাছে তাঁরা মহাশয় ব্যক্তি। আমার অসুখ হলে দেখতে যাবেন। দোকানে গেলে চা খাওয়াবেন। নেমন্তন্ন করবেন আমাকে আমারি জন্মতিথিতে। কিন্তু, যদি নূতন লেখক হই, রক্ষা নেই। ভাল করে কথা বলবেন না, এড়িয়ে চলবেন। অভদ্র বা রূঢ় ব্যবহারে কার্পণ্য থাকবে না। অথচ যেদিন আমার নাম হবে সেদিন থেকে আমি আবার খাতির পাবো।"

"আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধা নেই। আপনার তো নাম হয়েছে।"

"আমার নাম হ'লেও সুবিধা নেই খুব বেশী! আমি তো সাহিত্য-সম্রাট হতে পারি নি, যাঁরা সভা আলো করে বাণী প্রদানপূর্বক ঘরের গাড়ী চেপে নিজের বাড়ী ফেরেন। ছেলেমেয়ের বিবাহ বেশ দাঁও খুঁজে দেন যথারীতি, অথচ মুখে

ফ্রী-লাভের জয়গান করেন। ব্যবসা যাঁদের সাহিত্য, কালোবাজার যাঁদের কর্মক্ষেত্র, সেই সব ধুরন্ধরেরা একচেটে করে নিয়েছেন সাহিত্য। আমরা যে গরীব। আমরা বই লিখে অপেক্ষা করতে পারি না। তখন-তখনি টাকা চাই। আমাদের নিজের টাকা নেই যে বই ছাপাবো পয়সা খরচ করে প্রকাশককে কেয়ার না করে। তাই আমাদের প্রকাশক চেনে। অত্যন্ত কম টাকা দিতে চায়। জানে অভাব বাধ্য করবে ওই সামান্য টাকা নিতে। কেউ বা যত কপি বলে, ছাপায় অনেক বেশী কপি গোপনে। জানে, আমরা অসহায়। দেখে শুনে নেবার জোর নেই আমাদের। হয়ত প্রকাশক আর বই নেবে না। তবু তো এ প্রকাশক নগদ টাকা চুকিয়ে দেয়, অন্যেরা তো বাকী রেখেই কাজ সারে। এই ভেবে আমরা না দেখি, না দেখি করে থাকি।"

"গোড়াতেই বেশী টাকা চান না কেন?"

"দশটা খরচ দেখাবে। বলবে এর চেয়ে বেশী দিলে পোষাবে না। বাধ্য হয়ে কম টাকা নিতে হয়। যার যত অভাব তাকেই এরা তত কম দেয়।"

সম্পা বিস্মিত হইয়া মূঢ়ের মত প্রশ্ন আবার করিল, "কিন্তু লেখা তো আপনার।"

"হোক না। আপনাদের লোকে গাল দেয় প্রজার রক্তশোষণকারী জমিদার বলে। কিন্তু, এদের কিছু বলে না কেউ। ক্যাপিটালিষ্ট্ ক্লাসের অধম একটা শ্রেণী এরা। শ্রমিকের শ্রম অপহরণ করার দায়ে যারা অভিযুক্ত, এরা তাদের অগ্রগণ্য।"

'শ্রমিক, ক্যাপিটালিষ্ট' ইত্যাদি কথা সম্পা কাগজে পত্রে পড়িয়াছে মাত্র। রায়-বাড়ীর এলাকায় ও-সব কথা প্রবেশ করে না। এই নূতন সুরের বাড়ীতে নূতন সুর বাজিয়া ওঠে যখন-তখন। আচার-ব্যবহারে, চাল-চলনে ইহাদের নূতনত্ব খুঁজিয়া পায় সম্পা। গৌতমের কথায় পায় অন্য জগতের ইঙ্গিত।

"সব প্রকাশক কি এমনি?"

"ভাগ্যি নয়। তা'হলে তো লেখকেরা না খেতে পেয়ে এতদিনে মারা যেত। অনেকে আছেন, যাঁরা পয়সা কম দিলেও কখনও ফাঁকি দেন না। হিসাব-পত্র সব সময় দেখান, নিজে থেকে টাকা দিয়ে দেন। সমান ভাগ করে দেন লাভের টাকা। এ'রা আছেন বলেই আছি। কিন্তু, তবু তিল কুড়িয়ে তাল কত হয়? বাংলা বই বিক্রী হয় না ইংরাজি বই-এর মত! লেখকদের দুঃখ ঘোচে না।"

O'Shaughnessy -এর অমর কবিতার অপর অংশ সম্পার মনে পড়িয়া গেলঃ—

> "One man with a dream, at pleasure,
> Shall go forth and conquer a crown;
> And three with a new song's measure
> Can trample a kingdom down."

"আমি ভাবতাম সাহিত্যিক বা লেখকেরা কি সুখী, কত ক্ষমতা তাদের।"

টেবিলের পাশে ত্রিপদী হইতে গৌতম পোড়া-মাটীর কালো অ্যাস্‌ট্রেখানা তুলিয়া লইল। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া প্রশ্ন করিল, "কি অর্থে?"

"মানে, এই কত সম্মান, খ্যাতি পাওয়া যায়। কত টাকা, যশ।"

"খ্যাতি? লেখা এ দেশে ক'জনে বোঝে, বলুন? সভা-সমিতিতে যাঁরা হাততালি দেয়, তারা হয়তো সে লেখকের একটি লেখাও পড়েনি। যে প্রকাশক বই ছাপেন, যে কাগজ-ওয়ালা গল্প চান, তাঁরা তো লেখা পড়েন না। নাম দেখে নেন। এক লেখক অন্যের লেখা পড়েন না। তা'হলে খ্যাতির মূল্য কি? এ তো ভালমন্দ বিচার করে দেওয়া নয়। অন্যের হাততালিতে পাওয়া, আবার চোখের সম্মুখ থেকে সরলেই যাওয়া। এই খ্যাতিতে অমরত্ব নেই, অল্প সময়ের রামধনু।"

"আচ্ছা, বড় লেখকেরা কি করে সময় কাটান? অন্যের লেখা তো তাঁরা পড়েন না। তা'হলে? খালি লেখেন বুঝি?"

"লেখেন তো বটেই। চল্লিশখানার নীচে বই নেই কারুর। সে কি বই! যেন সপ্তকান্ড রামায়ণ এক একখানি। অজস্র উপন্যাস। উপন্যাস না লিখলে তো নাম নেই। আমি তো প্রাণপণ করে এঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছি না। একটা বড় গোছের বই লিখে ভাবি বেশ লিখলাম। দেখি, হায়রে, আমার পুরো-গামীরা পাঁচখানা তার পাঁচ ডবল লিখে ফেললেন।"

"তাতে ভাল হয় না কি, বড় বড় বই লিখলে?"

"হয় না? বই তো বেশী চলে লাইব্রেরীতে। মোটা দেখে দেখে লোক বই বেছে বাড়ী নেয়। ভালোমন্দের বিচার নেই সেখানে। তাই ভারী উপন্যাস না লিখলে গতি নেই।"

"লেখকেরা যখন লেখেন না, তখন কি করেন?"

"কেন? এ-ওর মুণ্ডপাত করেন। প্রকাশককে তোয়াজ করেন। রাজ-পুরুষদের সঙ্গে খাতির রাখেন। দু'পয়সার সুবিধে হ'বে যাতে সে চেষ্টায় ব্যস্ত

থাকেন। যাদের সংগে পরিচিত হওয়া লাভজনক, তাদের পরিচয় রাখেন। খবরের কাগজটা অবশ্যই পড়েন। তা'ছাড়া, যাঁদের বিদেশী-সাহিত্যে চৌর্য অভ্যাস আছে তাঁরা এক-আধটু বিশেষ বিশেষ বই পড়েন ও উদ্দেশে। এর পরে, আহার-নিদ্রা। সভা-সমিতি করা।"

"বলেন কি?"

গৌতমের মুখে বেদনার ছায়া পড়িল, "ঠিকই বলেছি। আমিও তো একদিন এঁদের মত হবো। হ'বার পথে চলেছি। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সাধনা আলোকের নয়— best seller লেখার।"

"লিখতে সত্যিই ভালো লাগে না?"

একটু নীরব থাকিয়া গৌতম বলিল, "লাগে এখনও! সে লেখা ছাপা হয় না।"

"মানে?"

"কবিতা।"

সম্পা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, "আপনি কবিতা লেখেন না কি? জানি না তো। কই দেখি, কই দেখি?"

"আহা, সবুর করুন। দেখাবার লেখা নয় সে। আমার নিজের লেখা। আমার নিজের ভাষা। কবিতাই তো লিখতাম প্রথমে। চলে না দেখে গদ্য ধরেছি।"

"এখনও চলে না? আপনার তো নাম হয়ে গেছে।"

"এখনও চলে না। প্রকাশক দশখানা উপন্যাসের সংগে একখানা কাব্যও ছাপাতে কুণ্ঠিত।"

"একটা দেখান না। হাতে খাতা না দিলেও পড়ে শোনান। অন্ততঃ একটা।"

গৌতম লাজুক হাসি হাসিল। গদ্য তাহার পোষাকী ভাষা, কবিতা ঘরের পোষাক। গদ্যে সে যাহা লেখে, তাহা দশের জন্য। কিন্তু, কবিতা তো নিজের মনের ডাইরি, নিজের পড়ার বস্তু। কিন্তু, এই মেয়েটি, যাহার রূপে ঊষার দীপ্তি, যে ধরণীর ধূলামাটির বক্ষে প্রতিমুহূর্তে অলকার স্বাদ বহন করিয়া আনিতেছে, যে তাহার নগণ্য দিনযাত্রার সংকীর্ণ পরিবেশে দেবতার আবির্ভাবের মত নামিয়া আসিয়াছে, কাব্য তো তাহারই নিমিত্ত। নিখিলের যত কবি দিবস-রজনী জাগরণে কথার মাল্য গাঁথিয়াছেন ইহার শ্রবণমূলের উদ্দেশে। গৌতম সহাস্যে বলিল, "শোনাচ্ছি। শুনুন ঃ—

"আনন্দময়ী মূরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা,
অমৃত-সরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"

সম্পা হাততালি দিয়া উঠিল, "আহা-হা, এ যেন আপনার লেখা, না? এ তো রবিঠাকুরের লেখা। ইস্, আপনি কি জোচ্চোর!"

"আমি পরীক্ষা করছিলাম আপনি 'পতিতা' কবিতাটা পড়েছেন কি না।"

"আমি তো কবিতা পড়তেই ভালবাসি। তাইতো আপনি কবিতা লেখেন শুনে আনন্দ হয়েছিল।"

"আমি কবিতা লিখি শুনে আনন্দ হয়েছিল! কেন?" স্বাভাবিক অপেক্ষা নিম্ন স্বরে গৌতম প্রশ্ন করিল।

সম্পা চকিত দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল। গৌতমের মুখে সিগারেট, ওষ্ঠাধরে চাপিয়া ধরিয়া আছে। আগুনের ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গের আভায় শ্যামবর্ণের দীপ্তি। সকাল বেলা দশটা। রুক্ষ চুল গরম বাতাসে ইতস্তত উড়িতেছে। সম্পা চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। কালকোলো ভিজে বেড়াল গৌতম নয়। শ্যামবর্ণে তাহার নবীন পল্লবের কমনীয়তা। নয়ন আকর্ণ। ভ্রূ তুলী-কৃত চিত্রের ন্যায়। অধর অতি-ধূমপানে পাটলবর্ণ ধারণ করিয়াছে, কালিদাসের বিরহিনীর বর্ণনা মাফিক। তীক্ষ্ন নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, হ্রস্ব চিবুক—সমস্ত মুখে বুদ্ধি ও প্রতিভার বিদ্যুৎ খেলিতেছে। সহাস্য সরসতায় অধরৌষ্ঠ বঙ্কিম। সম্পার মনে পড়িয়া গেল গৌতম একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক, খেলার সাথী নয়, সময় কাটাইবার বিচিত্র সামগ্রী মনে করিলে ভুল হইবে। সে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, পাশের বাড়ীর ছেলে। ভবিষ্যৎ আছে, সচ্চরিত্র। সে পণ্ডিত। বহির্জগতে এখনি সে জায়গা করিয়া লইয়াছে। রায়-বাড়ীর ছেলেদের প্রথায় কোটরে লুক্কায়িত নাই। তাই, রায়-বাড়ীও অনিচ্ছা-দত্ত শ্রদ্ধা গৌতমকে দিয়াছে। কিন্তু, এ পরিচয় নৈর্ব্যক্তিক। গৌতমের প্রধান ও প্রথম পরিচয় সে পুরুষ, সে যুবক। সে কি কাহাকেও ভাল বাসিয়াছে? কে জানে!

অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল কলরবে। গৌতমের ছোট দুই ভাইপো কাকার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইয়া সম্পাকে দেখিয়া থামিয়া গেল। রোরুদ্যমান অবস্থা তাদের, হাতে-মুখে চকোলেট মাখানো।

"এসো না এখানে।" সম্পা ডাকিল। এমন অবস্থায়ও তাহারা শিক্ষা ভোলে না। বাহিরের লোকের কাছে নিজেদের ঘরোয়া বিবাদ চাপা দেওয়া উচিত জানে তারা। তাই ইতস্তত করিতে লাগিল। গৌতম বলিল, "কি হয়েছে তোদের?"

লজ্জাজনক ইতিবৃত্ত। গৌতমের মুখ কঠিন, কান লাল হইয়া উঠিল। বড়খোকা পয়সা জমাইয়া চকোলেট ক্রয় করিয়াছে। ছোটখোকা তাহার ভাগ চাওয়াতে তাহাকে দেয় নাই। ফলে, মারামারি—কাড়াকাড়ির সৃষ্টি। বড়খোকা বলিল, "সেদিন তো তুমি পয়সা জমিয়ে ম্যাগ্নোলিয়া আইস্ক্রীম কিনে খেলে, আমাকে দিলে না তো?"

গৌতম চাপাগলায় ধমক দিল, "চুপ। খাওয়া-খাওয়া করে মর্লি তোরা।" হাত উদ্যত হইয়া উঠিল। আত্মসংবরণ করিয়া মাণিব্যাগ খুলিয়া একটা সিকি ছুঁড়িয়া দিল, "নে।"

ছোটখোকা কান্না ভুলিয়া সিকিটা তুলিল, "বাঃ, এতে কি হবে? পাঁচানার কমে তো নেই।"

"নেঃ। চলে যা।" আর একটা সিকি। দুই ভাই ত্রস্তে পলায়ন করিল। সম্পা অবাক হইয়া দেখিতেছিল। শান্ত-ভদ্র গৌতম হঠাৎ উগ্র হইয়া উঠিল কেন? ভাইপোদের হ্যাংলামী অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলার সম্মুখে প্রকাশ পাইলে লজ্জা হয় অবশ্য, রাগও ধরে। কিন্তু, গৌতমের রাগ যেন একটু বাড়াবাড়ি। যেন কারণের মূল আরও গভীরে।

সম্পা আবহাওয়া লঘু করিতে বলিল, "খুব দুরন্ত ওরা, না?"

"দুরন্ত? হ্যাঁ।" হঠাৎ গৌতম থামিয়া গেল—"দুরন্ত ওরা হলেও বড় লক্ষ্মী। কি করবে ওরা? সহ্যের সীমা আছে তো? ছোট বাচ্চা, স্বাস্থ্য ভাল। সর্বদা খেতে ইচ্ছা করে। চারপাশে রোজ একটা করে খাবারের দোকান হচ্ছে, লোকের পয়সা থাক না থাক। ওইসব খাবার লোভনীয়ভাবে সাজানো দেখে আমাদেরি লোভ হয়। ওরা কি করে থাকবে? বাড়ীতে তো ভাল কিছু খেতে পায় না। দারিদ্র্য ওদের নষ্ট করে ফেলেছে। লোভটুকু দারিদ্র্যের উপহার।"

সম্পা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বিনা কারণে নিজের দৈন্য এমন করিয়া উদ্ঘাটন করা কেন? কিসের ক্ষোভে অভদ্রের মত গৌতম বারে বারে অপ্রিয় কথা তুলিতেছে? এসব কথা তো আলোচনার বস্তু নয়। এ ধরণের অস্বস্তি

সম্পা গৌতমের বই পড়িয়া উপলব্ধি করে। সম্পা আর বসিতে পারিল না। ত্রস্তে উঠিয়া বলিল, "আমি যাই। স্নানের সময় হ'ল।"

সম্পার গমনপথের দিকে চাহিয়া গৌতম হাসিল। পলায়ন করিলে? অভিজাত দুহিতা তুমি, সৌখীন সাহিত্যিকা, নগ্ন দারিদ্র্যের মুখোমুখি একদণ্ড দাঁড়ানো তোমার সাধ্য নাই। এ জগৎ ভূতের মত তোমাকে তাড়া করে, পাখার বাতাসে, কবিতার পংক্তিতে তুমি ভুলিয়া থাকিতে চাও। তোমাদেরও অভাব আছে! সৌখীন বস্তুর জন্য সৌখীন অভাব। কিন্তু তুমি তো জান না প্রকৃত অভাব কি? অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব। নিছক খাদ্যের অভাব। আমার দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী গহ্বর। তুমি ডুবিয়া গেলে, অদৃশ্য হইলে। এমনি সব যাইবে। আশা আকাঙ্ক্ষা, মহত্ব, বিশেষত্ব সব —সব ডুবিবে। শিশুগুলিকে রক্ষা করা যাইবে না। যত বিশেষত্ব যত মস্তিষ্ক থাক, তাহারা চিরদিন পিছনে পড়িয়া থাকিবে। পিছনে থাকিতে অভ্যস্ত তারা, সম্মুখে অগ্রসর হইতে কয়জন সক্ষম হইবে? যাক, সব যাক।

কিন্তু, তুমি সম্প্রীতি রায়, একটু থাকো। আমার জীবনে তোমার ছায়া একধারেই পড়ে। সম্প্রীতি, তুমি জানো না। কত কি জানো না তুমি? বাতির কৃত্রিম আলোকে ক্রমাগত কলম-পেশা। যা মন চায়—তা নয়, যা বিক্রয় হইবে। যার মূল্য আছে, সেই অমূল্য সম্পদে বংগ-ভারতীকে সমৃদ্ধ করিবার সময় নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৌতমের নাই। গৌতমের সাহিত্য সাধনার মূল্য—অর্থ। তুমি গৌতমকে প্রতিভাশালী বলিয়া ভ্রম করিয়াছ, তাই নিকটে আসিলে। কিন্তু, তুমি জানো না আতস-বাজীর দ্রুততায় সে প্রতিভা নিঃশেষিত প্রায়। দেশের মাটিতে নিরন্নের অধিকার নাই। কৃষক শ্রমের দ্বারা সূচ্যগ্র ভূমিরও অধিকার পায় না। তাহাদের দুঃখে বিগলিত বহু গ্রন্থকার দীর্ঘকায় পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা যশস্বী ও অর্থ-শালী হইয়াছেন। শ্রমিক কলের গায়ে প্রত্যহ তৈল-লেপন করিলেও একবিন্দু অধিকার পায় না। যে কিনিতে পারে, কেবল সে-ই মালিক। তবু, তাদের দুঃখে বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লব। কিন্তু, কোন্ দেশে প্রতিভার এমন অপমৃত্যু ঘটে, এবং কোন্ দেশের লোক সে সম্পর্কে এত নির্বাক? প্রতিভার শোষণকারীদের নাম কেউ উল্লেখ করে না। প্রতিভা দিয়া কারও প্রয়োজন নাই। প্রতিভা ঝরিয়া পড়ে। তাই গৌতমের প্রতিভা অবসিত। এখানে কে বোঝে? কিন্তু, সম্প্রীতি, সম্পা তোমাকে আমি তা বলিতে পারিব না। দারিদ্র্য গোপন করি নাই। সমস্ত বাধা, সংকোচ ত্যাগ

করিয়া বলিতে পারিয়াছি। কিন্তু, এ দৈন্য যে আরও লজ্জাকর। দরিদ্র জানিয়াও আসিয়াছ, দীন জানিলে আসিবে না। আমার প্রতিভা আমি হাটের পণ্য করিয়াছি, এ গ্লানি তোমাকে বলিবার নয়।

সম্পা, এখনও আমার প্রতিভা জাগিতে পারে। একদা যে শক্তি নিজের মধ্যে অনুভব করিতাম; শিহরিত হইতাম; বিনিদ্র রাত্রে, নিরালাক্ষণে চমকিত হইয়া দেখিতাম আমি সামান্য নই, সে শক্তি আজিও অবহেলা ও পীড়নে সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় নাই। অমরত্বে যাহার দাবী, তাহার মৃত্যু অত সহজ নহে। আজও হয়তো সে শক্তি জাগিতে পারে। মৃতকল্প মূর্চ্ছা হইতে উত্থিত হইয়া আমার সেই বিস্মৃত প্রতিভা শতাব্দীকে আপন সম্পদ্রে প্লাবিত করিতে পারে, সংস্কৃতি-মণ্ডলে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব আনিয়া দিতে পারে, যদি সম্পা, তুমি আমার পাশে থাকো। ব্যাকুল বসন্ত রজনীতে, বর্ষার বারিসিক্ত দিবসে যে অনির্বচনীয়ার প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া মরিয়াছি সে তো তুমি, সম্পা। যে অনাগত প্রেম জীবনের শুষ্ক মৃত্তিকায় শ্যাম ফসলের সোনার হাস্য আঁকিতে পারে, সে প্রেম তুমিই আমাকে দিতে পারো। তোমার মত একজন কেউ আছে জানিতাম, বুঝিতাম। যদি সেই তুমি আসিয়াছ, একটু অপেক্ষা কর।

জানি তুমি পাইবার নও। তোমার জগৎ ও আমার জগতের দেখা হইলেও যোগ হয় না। তবু বিনিদ্র মনের কামনা তোমাকে লইয়া, তোমার স্পর্শের আশায় উন্মুখ শরীর। সম্পা, তোমাকে ধরিতে পারিব না। কিন্তু, মায়ামৃগী, যাইবার পূর্বে একটি চুম্বন দিয়া যাও। তোমার অধরের চুম্বনের লোভ ত্যাগ করিতে পারিব না। তোমাকে ছাড়িতে হইবে। কিন্তু, মানুষের ত্যাগের সীমা আছে, নিবৃত্তির শেষ আছে। রসাতলে যাইবার পূর্বে ওই একটি বস্তু আমার চাই। তাই সম্পা, তুমি আর একটু অপেক্ষা কর।

ছয়

হে মধুকরী, জীবনের দীর্ণ শাখায় আজ তোমার পদভর অনুভব করিয়া ধন্য হইলাম। তুমি আরও কাছে এস। শুষ্ক ফুলে ফুলে মধুর সঞ্চয় চাহিয়া ব্যর্থ ভ্রমণে তোমার পক্ষ দুইটি ক্লান্ত করিয়া লাভ নাই। এ মধু সঞ্চিত আছে গোপন পত্রকোষে। অনাহূত দৃষ্টি-আক্রমণের বাহিরে হৃদয়-অমৃত গোপন রাখিয়াছি। হে মধুকরী, জীবনব্যাপী মধুসঞ্চয় তুমি কি গ্রহণ করিবে না?

অসহিষ্ণু গৌতম লম্বা কালির টানে লেখা পাতা দ্বিখণ্ডিত করিল। নিদারুণ গরমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিপ্রহরের দীর্ঘ অবকাশ বৃথায় নষ্ট হইল। ঘরে পাখা নাই। একখানা টেব্‌ল্‌-ফ্যানের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অসম্ভব দাম। তাই এবারেও, 'থাক, সামনের গরমে দেখা যাবে', চিন্তার দ্বারা গৌতম দারুণ গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া আছে। মাঝে মাঝে অসহ্য গরমে যখন একহাতে হাতপাখা, অন্যহাতে কলম চালনা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন চকিতে ক্লান্ত লেখকের মনে দেখা দেয় অদেখা শৈলনিবাসের ছবি। কত ছবিতে দেখা হিমালয়ের শুভ্র শৃঙ্গশ্রেণী, শিলংএর প্রাকৃতিক দৃশ্য, সিমলার তুষারপাত, মুশৌরীর হোটেল চোখের সম্মুখে মরুভূমির ওয়েসিসের ন্যায় প্রলুব্ধ করে। পরিচিতদের মুখে শোনা যায়, "কালিম্পং যাচ্ছি", "কার্শিয়ংএ বাড়ী নিয়েছি।" গৌতমের বাঁধা কাজ নাই। নিজের মালিক সে নিজে। পয়সা থাকিলে অনায়াসে দুইমাস শৈলনিবাসে কাটাইয়া আসিতে পারিত। তাহা হইলে কত লেখা লিখিতে পারিত সে! দুই মাস কেন? জীবনে পাহাড় চক্ষে দেখে নাই। দুই দিন থাকিয়াও যদি পাহাড় দেখিতে পাইত! যাহাদের চোখ নাই, তারাই দেশবিদেশে স্বাস্থ্য-অন্বেষণে ও মুখ বদলাইতে যাইয়া থাকে। দরিদ্র মন লইয়া ধনীরা বিদেশের পথেঘাটে ফেরে। চারিদিকে যে প্রকৃতির রসলীলা, তাহাতে চোখ নাই। কলিকাতা শহরের সমস্ত অভ্যাস তাহারা সঙ্গে করিয়া নেয়। যে ওই দৃশ্যে উপনীত হইতে পারিলে অজস্র রসসৃষ্টি করিতে পারিত, তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হয় এই গলির বাড়ীতে গরমের কুণ্ডে।

গৌতম ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। ছায়াশীতল পাহাড়ের গায় ঘন কুয়াশা অন্ধকারের মত নামিয়া আসিয়াছে। প্রখর রৌদ্রের অগ্নিদাহ সেখানে পরাজিত। কত ফুল পথের দুপাশে ঘাসঢাকা পাহাড়ের গায়ে। হিমশীতল বায়ু ক্লান্তি নিমেষে উড়াইয়া ফেলে। গ্রীষ্মের অগ্নিবাণ হইতে আশ্রয়—শৈলনিবাস।

গৌতম নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিল। স্নিগ্ধ গিরি-স্বপ্ন অন্তর্হিত। সম্মুখে অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসের পাতাগুলি খোলা আছে। টাকার বড় প্রয়োজন গৌতমের। লেখা বাদ দিয়া স্বপ্ন-বিলাস সাজেনা—হোক না কেন সে স্বপ্ন বিশ্রাম। ছোট ভাইএর পড়ার খরচ গৌতম যোগায়। সংসারের কয়েকটি বড় বড় খরচও বহন করিতে হয়। বোনদের বিবাহ হয় নাই। তাহারা সুরূপা ও গুণবতী হইলেও যতটুকু ব্যয় বিবাহে প্রয়োজন, পাত্রপক্ষের অন্য কোন চাহিদা না থাকিলেও মাত্র সেইটুকু ব্যয়ের সামর্থ নাই। পাত্রপক্ষ কন্যা দেখিতে আসিলেও খরচ। তাই

মেয়ে দেখানো হয় না। ওই সমস্ত আহারাদি বাচ্চাদের মুখে দিলেও লাভ। তাছাড়া, মেয়ে দেখানো তারা পছন্দ করে না। তবু বোনদের বিবাহ-চিন্তা দিনদিন পাহাড়ের ন্যায় ভারী হইয়া উঠিতেছে। তারপরেই, ভাইঝিদের বিবাহ, ভাইপো-দের পড়াশোনা। নিজের বিবাহের সাধ নাই গৌতমের। সামর্থ নাই, সুতরাং ও বিলাস কেন? কাগজ কলম লইয়া জীবনটা কাটাইয়া দেওয়া যাক। মাথা নীচু করিয়া গৌতম লিখিতে লাগিল।

কিন্তু, এ কি লেখা? সমস্যামূলক উপন্যাস লেখে গৌতম, কাটা কাটা কথা, নির্মম বিন্যাস। গীতি-কবিতার মাদকতা তাহার নহে। আজ পাতার পর পাতা সে কি লিখিয়া যাইতেছে? শোষক ও শোষিতের মর্মবাণী যে উপন্যাসের প্রাণ, প্রেমের বন্যা কেন অহেতুক প্লাবনে সেখানে নামিতে চায়? এ উপন্যাস তো চলিবে না। স্বপ্নের ঘোর বোধ হয় এখনও চক্ষে আছে। লেখা পাতাটা গৌতম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কাটিল। আজকাল এই রকম হইতেছে। তাহার লেখা যেন অন্য ভাষা ধরিতে চায়। না, উপন্যাসে এ তো চলে না। তবু যে সামীপ্য তাহার এ অনর্থের মূল, তাহাতে অমৃত ফলিয়াছে। গদ্যলেখক, ধারালো গৌতম মুখোপাধ্যায় অসুবিধায় পড়িয়াছে। কারণ, মনের শানিত বৃত্তি শ্যাওলা-ধরা প্রস্তরখণ্ডের সাদৃশ্য ধরিতেছে। তীক্ষ্ম বুদ্ধি যেন মদির স্বপ্নে আচ্ছন্ন হইতে চায়। কলমে তেমন ধারালো, বিদ্বেষমূলক কথা যোগায় না। তবু কবিতা, যে কবিতা গৌতমের প্রাণ, সে কাব্যে প্রাচুর্য, প্রাণপ্রাবল্য দেখা দিয়াছে। গোপনে-রাখা খাতার পাতায় অলকা নির্মিত হইতেছে। না—না অলকা নয়, তাজমহল। বিরহ এ সৌধের ভিত্তিমূল। কতদিন সম্পা কবিতা শুনিতে চাহিয়াছে, গৌতম পারে নাই।

নাঃ, লেখা চলিবে না। লেখার মুড্ নাই। ইচ্ছা করে, কেবল কবিতা লিখি, ক্রমাগত লিখিয়া যাই। কবিতা লিখিলে তো চলে না, গৌতম। কবিকে যতই কেন না আনন্দ দেয়, পেটে ভাত, পরণে কাপড় যোগাইতে তো পারে না কবিতা। তার চেয়ে উঠিয়া পড়। ছোট গল্পটা লইয়া যাও। যাহারা চাহিয়াছিল, তাহারা আসে নাই। তবে, তারা টাকা দিবে অনেক। কম মাসিকপত্র এত টাকা দেয়। যাও, বল, "এপথে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম দেখা করে যাই।" এমন মিথ্যাচার প্রতিমুহূর্তে অর্থের নিমিত্ত করিতে হয়। গৌতম জামা গায়ে দিল। এমন অগ্নিকুণ্ডে সিদ্ধ হওয়া অপেক্ষা কোনমতে পথ পার হইয়া পাখার বাতাসে যাইয়া বসা যাক। সম্মুখের গ্রীষ্মে অবশ্যই পাখা আসিবে।

গৌতমের গ্রীষ্ম-কাতর দেহ সহসা চন্দন-স্নিগ্ধতায় অবশ হইয়া গেল। মন্দ কি? ছোট ঘর, কিন্তু দ্বার বন্ধ করিলেই তো সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ হইয়া যায়। ছাদে পাখা, দরজায় কারুশিল্প—আঁকা পরদা, টেবিলে একঝাড় রজনীগন্ধা। পরিষ্কার, নরম বিছানা। সুখী হইতে আর কি লাগে? এক তরুণীর কেশ-সুবাস, আঁচলের পুষ্পসার পাখার বাতাসে প্রবাহিত-অবস্থায় ছোট ঘরটিকে উদ্বেল করিয়া তুলিবে। মন্দ কি? অর্থ না থাকিলেও ভালবাসা আছে।

কিন্তু, সম্প্রতি এ স্বপ্ন আর নাই। কেন এমন হয়? গৌতমের তুচ্ছ জীবনের সামান্য সুখের আশা এমন করিয়া অন্তর্হিত হইল কেন? কেন এ স্বপ্ন আর ভালো লাগে না? মনের একপ্রান্তে ভবিষ্যতের এই রকম ছবি ছিল। সে ছবি নিয়তির নির্মমতায় মুছিয়া ফেলিল কে? গৌতমের দরিদ্রদিনের আয়াস-স্বপ্ন আর নাই। সে জানে মায়ামৃগীর পশ্চাদ্ধাবনের সমাপ্তি হতাশায়। তবু সম্পা, তোমাকে ভালবাসিলাম।

চা-পানের পিপাসা অনুভূত হইল। গৃহপ্রস্তুত চা সেবনে পয়সা বাঁচিত। কিন্তু, হাড়ভাঙগা খাটুনির পরে গরমের দিনে বোনেরা দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতেছে। এত গরমে অবশ্যই তারা জাগিয়া আছে। তবু, তাদের ডাকিয়া গরমের মধ্যে চা করিবার আদেশ গৌতম দিতে পারিল না। হয়তো, তারাও স্বপ্ন দেখিতেছে। সত্যই কি তাহারা স্বপ্ন দেখে? সম্পার বাড়ীর বিলাস ও আভিজাত্য তাহাদের সরল দিনযাত্রায় অন্য স্বপ্ন কি আনিয়া দেয় নাই? সম্পার সহিত মিশিয়া কাহারও ভাল হয় নাই।

সম্পা বিরক্তভাবে লেখা পাতাটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। গোপনে সে লেখা অভ্যাস করিতেছে। আজকাল মাঝে মাঝে করে। কবিতা বিশেষ ভালবাসিলেও কবিতা লেখা সম্ভব নয়। অগত্যা নিছক গদ্যই লেখে সে। একটা গল্প লিখিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, কি করিয়া সূত্র ধরিয়া টানিয়া অগোছালো বস্তু গোছানো যায় তাহা সে জানে না। গৌতম যে কি করিয়া অত বড় বড় বই লেখে? গৌতমের প্রায় সমস্ত বই সম্পা পড়িয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু, কেমন যেন অস্বস্তি লাগে!

আচ্ছা, গৌতম কি সুখী! নিজের ইচ্ছামত লেখা। না হয়, না লেখা! কত নাম! যতই যা বলুক না কেন গৌতম, সাহিত্যিক ও লেখক-জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন। সৌন্দর্য সৃষ্টি। লোকের প্রশংসা। আহা, সম্পা যদি লেখিকা হইত

ছায়া বৌদির কয়েকদিন হইল শরীর খারাপ। সুতরাং সর্দ্দারী ক্ষান্ত। তবু শয্যাগত অবস্থায় নিজের কাজ সে ভোলে নাই। ঝি ট্রে হাতে ঘরে ঘরে আইসক্রীম সরবরাহ করিয়া গেল। অসহ্য গরম। ছায়া ঠিক তিনটার সময় শীতল পানীয়ের ব্যবস্থা রাখিয়াছে।

"পাখাটা বাড়িয়ে দাও তো।" ঝি পিতলের ভারী ট্রে নামাইয়া পাখার গতি দ্রুততার শেষঘরে ঠেলিয়া দিয়া গেল। পাত্র হইতে চামচ দ্বারা মালাই মুখে তুলিতে তুলিতে সম্পা ভাবিল, 'সেজবৌদির শরীর ভাল থাকলে এবার সেজদা দার্জ্জিলিংএ নিয়ে যেত। মোটা বোনাস পেয়েছে কিনা। সব মাটী হল। এ গরমে থাকা যায় না। কেন যে বৃষ্টি হয় না ছাই! কলকাতায় এত গরম কই আগে পড়েনি তো।'

মৌলিক লেখা সম্পার দ্বারা হইবে না বোঝা যায়। তবে সে অন্য লেখকদের জীবনী রচনা করিবে। তাহা হইলেই তো সাহিত্যে অবদান থাকে। মস্ত বড় কাজ এটা। সাধারণ লোক সাহিত্যিকদের চিনিবে, বুঝিবে। বই পড়িয়া হৃদয়ভরা আগ্রহ ও কৌতূহল চাপিয়া পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইবে না। সম্পা বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিবে সকলের নিমিত্ত। সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে সম্পার নাম লেখা থাকিবে ওই সাহিত্যিকদের পাশে পাশে। অমর হইবার সহজ উপায় এইতো আছে। এতদিন কেন মনে পড়ে নাই! সম্পা লাফাইয়া উঠিল। কাল হইতেই কাজ আরম্ভ করা চলিবে। আগে গৌতমের সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন। সন্ধ্যার সময়ে ওবাড়ী যাওয়া যাইবে। চকিতে নিদাঘতাপের জ্বালা স্নিগ্ধ হইয়া গেল। মনে ভাসিয়া আসিল পাশের বাড়ীর ছোট ঘরখানি। অনাড়ম্বর সহজ। ছোট তক্তপোষে সাদা বিছানা। টেবিলে অবিরত পরিশ্রমের চিহ্ন কাগজ কলম। পাশের চেয়ারে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপে কি সুখ! কত কথা হয়। কত জানে গৌতম, কত বোঝে! কত পড়াশোনা তাহার! সম্পার জীবনে যে এমন বন্ধু লাভ হইবে কে জানিত? শুভ মুহূর্ত্তে গৌতমকে সে পাইল। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। বৃহত্তর, মহত্তর জগতের পরিধির মধ্যে সম্পার এই গৃহগত আরামের জীবন মুক্তি চায়। সম্পা যেন অন্য লোক হইতে বসিয়াছে। শুভক্ষণে গৌতমের সঙ্গে দেখা হইয়াছে।

ছায়া আইসক্রীম খাইতে পারিল না। পাশবালিশটা চাপিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। লেডি ডাক্তার শুইয়া থাকিতে বলিয়াছেন। মাতৃত্বের সোপানে পদক্ষেপ করিতে যাইতেছে ছায়া। মনে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা! ভয়ও প্রচুর। তবু

বিভিন্ন ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও ছায়া ভুলিতে পারিল না বিরাট রায়-বাড়ীর কথা। অসংখ্য দাবীদাওয়া, অসংখ্য দিক।

সম্পা যেন বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে পাশের বাড়ী লইয়া। ক্রমাগত যাওয়া চাই। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ ও ওবাড়ীর প্রতি দৃষ্টি পাতিয়া রাখে। কে ওবাড়ী কি করে, না করে সম্পার নখদর্পণে। যদি সম্পা না যায়, ওবাড়ীর লোকেরা আসে। না আসিলে সম্পা ডাকিয়া আনে। ছোট বাচ্চাদের খাওয়ায়, উপহার দেয়। ওবাড়ীর মেয়েরাও শুধু হাত পাতিয়া নেয় না। এটুকু শিক্ষা আছে তাদের, স্বীকার করিতেই হইবে। সম্পার ঘর চটের আসন, হাতে আঁকা ছবি, উলের জামায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। আলাপ প্রায় নয় মাস পুরিয়া আসিল। ছায়া শারীরিক অস্বস্তিতে পাশ ফিরিয়া আবার শুইল। নাঃ, মেয়েগুলো গুণী আছে। কি হাতের কাজ! এত রকম কাজও জানে? সময় থাকিলে ছায়া কিছু কিছু শিখিয়া লইত। কিন্তু, ছায়ার সময় কই? এতবড় বাড়ীর দেখাশোনা সব ছায়ার ঘাড়ে। এতবড় পরিবারের সুখ সুবিধার নিমিত্ত দায়ী ছায়া। তাহাতে এখন শরীর এত খারাপ। এর পরে ছেলে মানুষ করা আছে। রায়-বাড়ীর সন্তান যা-তা ভাবে মানুষ করা চলিবে না। সম্পা আবার হাঘরের দল জুটাইয়া আনিয়াছে। আচ্ছা, এরা আশ্চর্য মানুষ। আমরা আসিয়াছি গরীবের ঘর হইতে। আমরা যে-সে লোকের সংগে মিশিনা। ইহারা পছন্দ করে না বলিয়া নিজেদের এই ভাবে গঠন করিয়া লইয়াছি। কিন্তু, এরা তো মুখোপাধ্যায় বাটীর সহিত মেলামেশায় আপত্তি দেখায় না। আশ্চর্য!

কদমমণি চোখমুখ টানিয়া গৃহিনীর কাছে গল্প করিতেছিল, "বলি এখানে কি সবই অনাছিষ্টি? সময় হয়ে গেল, ব্যথা উঠলো না। নেড়ি ডাক্তার হুকুম দিলেন জোর করে প্রসব করানো হবে। শোন কথা। আগে হ'লে ভগমানের মুখ চেয়ে থাকতে হ'ত। যেদিন দেবেন তিনি সেদিন সন্তান আকাশ থেকে নেমে আসবে মায়ের পেটে। আবার যেদিন তাঁর মরজি হবে সেদিন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়বে। ওম্মা! তোমার বউএর কথা শুনে মরি গো, দিদি। নেড়ি ডাক্তার বিধেন দিয়েছেন ব্যথা উঠুক না উঠুক ছেলে চাই। এখন টানাপোড়েনে বাছার প্রাণটা না যায়।"

গৃহিনী ছায়ার আসন্ন প্রসব-ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বনেদী রায়-বাড়ীতে বৈজ্ঞানিক যুগের ছোঁয়া লাগিয়াছে। তবু অন্য বধূদের বেলায় নবতম কৌশল প্রয়োজন হয় নাই। মুখে আশ্বাস দিলেন গৃহিণী,

"তুমি আর কতটা জান, কদম। কতরকম নূতন আবিষ্কার হয়েছে। ঘরে ঘরে এখন এসব ব্যবস্থা।"

"তা যা বলেছ, দিদি। কিন্তু, লাভ কি হয়েছে? পাড়াগাঁতে সেকেলে মতে বেশ ভালোই তো ছিলাম। এখন নিত্যি আবিষ্কারে কি হচ্ছে?"

কদমমণির ম্যালেরিয়া-শীর্ণ শরীরের দিকে চাহিয়া রায়গৃহিণী সকৌতুকে হাসিলেন, "তোমার যা হ'ল। ওখানে তো মরতে বসেছিলে।"

কদমমণি অপ্রতিভ হইল,—"তা যা বলেছ, দিদি। ভাগ্যে তুমি আনলে। নইলে তো এঁদো পুকুরের পাড়েই প্রাণটা রাখতে হ'ত। ভালো ভালো আবিষ্কার হয়েছে বৈকি। এতদিনের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, শহুরে চিকিৎসার ঠেলায় পালালো। তা তোমার ছেলেরাও তো আবিষ্কার করবে। কলেজ থেকে ফিরে দেখি তোমার বিনয় মুখ গুঁজে কি জন্তর-মন্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। নিখিল তো তোমার নামী ছেলে।"

গৃহিনী নিশ্বাস ফেলিলেন। এক নিখিল লেখাপড়ায় সফল হইয়াছে তাঁহার অসংখ্য সন্তানের মধ্যে। বিনয়ের আশা থাকিলেও তাঁহার ভরসা নাই। রায়-বাড়ীর বংশধরের কোন ভবিষ্যৎ থাকেনা। মেয়েরা তাঁহার সাধারণ। পাশের বাড়ীর সহিত মিশিবার পরে আজকাল প্রায়ই ক্ষোভ জাগে মনে।

ঘরের সম্মুখ দিয়া বিনতা চলিয়া গেল স্নানের ঘরে বৈকালিক অবগাহনে। তাহার কণ্ঠের চাপা গান ধ্বনিয়া উঠিলঃ—

"দারুণ অগ্নিবানে হৃদয় তৃষয় হানে।
ভয় নাহি, ভয় নাহি,
গগন রয়েছে চাহি।
জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে।"

গৌতমের বোনের গলা হইতে গানটা সে তুলিয়াছে। ইতিপূর্বে গানে ঝোঁক ছিল না বিনতার। গৃহিণীর কানে কন্যার গান মধু ঢালিয়া দিল। কে জানে, বিনি হয়তো নামকরা গায়িকা হইতে পারে। বিনির সঙ্গীত শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করিলে হয়।

কদমমণি শীতলপাটীতে গা ঢালিয়া বলিল, "আঃ, বেশ মালাইটা খেলুম, দিদি। তা, বিনি তো বেশ গাইছে। ওবাড়ীর মেয়ের ঠেঞে শিখেছে নাকি?"

"নিজেই শুনে শিখেছে। ওবাড়ীতে হরদম যাতায়াত তো।"

কদমমণি চক্ষু নাচাইয়া ফোড়ন দিল, "তা, যা বলেছ। সম্পা ষাটের কোলে এখন বড় হয়েছে। হুট্‌হুট্‌ করে যখন-তখন অতবড় সোমত্ত ছেলের সামনে যাওয়া কি ভাল দেখায়? কি করবে তুমি? মেয়ে তো বাধ্য নয়।"

গৃহিণী বিরক্ত হইলেন, "ওবাড়ীতে যাওয়ায় আমার কোন আপত্তি নেই। ওরা গরীব হলেও শিক্ষাভালো। কত গুণ আছে। ওদের সঙ্গে মিশে এরা ভাল ছাড়া মন্দ হবেনা। আর, ওসব কি বলছো? সম্পা একেবারে অন্য ধরণের মেয়ে। জ্ঞান-বুদ্ধি হয়নি ওর। ছেলেমেয়ের প্রভেদ বোঝেনা। ছেলেটি বড় ভালো। ওর সঙ্গে মিশে সম্পা উন্নতি করতে প্যরবে।"

পরানুগ্রহী জীবের তোষামদে কদমমণি তাড়াতাড়ি বলিল, "তা ঠিক, তা ঠিক। যা বলেছ। এইটুকু ছেলে, ক্ষ্যামতা কি! কতগুলো বই লিখে ফেলেছে। একডাকে সবাই চেনে।"

সাত

"আজ কবিতা শোনাতেই হবে, গৌতমবাবু। কি চমৎকার সন্ধ্যাটা দেখুন। বৃষ্টি খুব হয়ে গেল একচোট।"

"ভাগ্যি হোল। যা গরম পড়েছিল! দুঘণ্টা একটানা বৃষ্টি হয়ে গেছে।"

"সাড়ে তিনটেয় নেমেছিল। আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

"প্রকাশকের পদলেহন করছিলাম।"

"যান। কি যে সব কথা বলেন! আচ্ছা আপনি এমন কেন?"

"কেমন, মিস্‌ রায়?"

"কেমন যেন! বেশ আছেন। থাকতে থাকতে হঠাৎ অন্যরকম হয়ে যান। তখন আপনাকে আপনার লেখার মত লাগে।"

"যাক, একটা কথা জানা গেল। আমার লেখা আপনার 'কেমন যেন' লাগে, না, সম্পা দেবী?"

"ঠিক তা বলিনি।"

"বুঝেছি।"

"কি বুঝেছেন?"

"আমার লেখা যে জীবনের কথা বলতে চায়, সে জীবন চেনেন না। যদি তার মুখোমুখী পড়েন এড়িয়ে চলতে চান। ভয় পান আপনি। ভুলে থাকেন।"

"না, না!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! অত নিরাশা, হতাশা, অতৃপ্তি সহ্য করতে পারেন না আপনি। তাই ভালো লাগেনা। সত্যকে তো অনেকে চায়না—সহ্য হয় না।"

"ওই সত্য নাকি?"

"নিশ্চয়! সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ধ্বংসের করাল তাণ্ডব চলছে। কে কাকে পারে গ্রাস করতে। শুধু সবলের জন্যে এ জগৎ। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।' তবু, যারা এ-উগ্র জীবন-রেসে পিছিয়ে পড়ে থাকে, যারা ব্যর্থ হয়ে যায়, তাদের কথাও ভাববার লোক এখনও আছে। ঈশ্বর এটুকু দয়া তাদের করেছেন। তাদের কথা লিখে যাই আমরা। এ আমাদের ব্রত।"

"সবাই কি ব্রতধারী?"

"না, না। কত কি করতে হয়। ভেজাল চালাই আসলের নামে সজ্ঞানে, স্থিরমস্তিষ্কে। মুখে লম্বা-লম্বা কথা বলি, স্বীকার করি না। ভক্ত চাই তো। সে মোহ সাহিত্য-সম্রাট থেকে সুরু করে সবাকার আছে।"

"গৌতম বাবু, চমৎকার সন্ধ্যাটা। মেঘে আকাশ ভরে আছে। টেবিলে তো বেলফুলের মালা রেখেছেন। তবে এ-ধরণের কথা বন্দ দিন আজ।"

"আচ্ছা, দিলাম।"

"একটা কাজ করবো। আপনার সাহায্য চাই। লেখকদের একটা জীবন-চরিত-মালা লিখবো। রেফারেন্স বই গোছের। সবাকার নাম থাকবে। লোকের কত কাজে লাগবে। ওকি, হাসছেন যে?"

"না, হাসবো কেন? বলুন আমাকে কি করতে হবে। আমি প্রস্তুত।"

"এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। প্রথমে মেয়েদের কথা লিখবো। তাহলে সুবিধা হ'বে। সুভদ্রা মিত্রকে দিয়ে আরম্ভ করবো। ওঁকে দেখবো কোথায়?"

"আমি দু'চারদিনের মধ্যে 'শিল্প-পরিষদে' যাবো। উনি সেদিন আসবেন। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। ওখানে আলাপ করাই সুবিধা। তারপরে আপনি যা হয় করে নেবেন।"

"আচ্ছা। বাড়ীতে শুনে জানাবো।"

"ও, মত নিতে হ'বে নাকি? আপনি যে বিখ্যাত রায় পরিবারের মেয়ে সেকথা ভুলে হ'য়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম মুহূর্তের ভুলে, আপনি আমারি মত হা-ঘরে।"

"আবার! আপনার এই মুড্ ভাল লাগেনা আমার। নিজেকে হা-ঘরে বলে অপমান করছেন কেন?"

"আহা, হা-ঘরে মানে তো বেদে। সাহিত্যিক আমরা, বোহেমিয়ান।"

"সন্ধ্যাটা নষ্ট না করে ছাড়বেন না দেখছি।"

"আচ্ছা, ঘাট মানছি। এখন কি করলে সন্ধ্যাটা নষ্ট হবেনা বলুন।"

"আজ আপনার কবিতা শোনাতেই হ'বে। কোনদিন শোনান নি।"

"সহ্য করতে পারবেন?"

"গদ্য পেরেছি, পদ্য পারবোনা? বার করুন খাতা। শিগ্গির।"

"মিস্ রায়, থাক।"

"না, না,। আজ ছাড়বোনা। না শোনালে কথা বলবো না।"

"আচ্ছা, এই যে খাতা! শুনুন তাহ'লে।"

"আচ্ছা, খাতার নাম 'তোমাকে' কেন? খাতা তো ভর্ত্তি দেখছি।"

"'তোমাকে' মানে তোমাকে। আর কি? শুনুনঃ—

শুধু তুমি আর আমি একা এই ঘরে,
—যদি তুমি রহিতে আমার!—
উষ্ণ সান্নিধ্যে ছুঁয়ে ইন্দ্রিয়ের দ্বার
অধর আনিতে কাছে চুম্বনের তরে।
চুম্বন প্রতীক্ষু ওষ্ঠ নামাতে অধরে।
শুধু তুমি আজ প্রিয়া, তুমি-আমি একা;
বিগলিত দেহকান্তি দেখে কামনায়।
চেতনায় জ্বলে যেত বাসনার রেখা,
মালা হ'ত দুটি হাত আমার গলায়।
আমার শয্যার বুকে এলাতে শরীর,
রোমকূপে জানি প্রতি আমাকে কামনা,—
আমার কুমারীশয্যা আনন্দে অধীর,
সফল মুহূর্তে হোত বর্ষণ-বেদনা।
আর কারে চাই নাই—তুমি ভালবাস;
শুধু তুমি একা প্রিয়া, হৃদয়ে আমার

আমার অন্তরে দেখ, বর্ষা একাকার,
নির্জন আঁধার গৃহে কল্পনা-বিলাস।

চুপ করে আছেন কেন, সম্পা রায়? কেমন লাগলো?"

"ভাবছি। এ লেখার সঙ্গে তো গদ্য লেখার কোন মিল নেই আপনার। আমি ভেবেছিলাম বোধ হয় গদ্যের সুরেই আপনি কাব্য লেখেন। এতো প্রেমের কবিতা।"

"প্রেম আমার পক্ষে নিষিদ্ধ নাকি? জলবাতাসের মত প্রত্যেক মানুষের প্রেমে অধিকার আছে।"

"তা বলছি না। আচ্ছা, কাকে লিখছেন? জানতে ইচ্ছা করে। ওকি, মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন চুপ করে? বলুন।"

"বলছি। আর একটা কবিতা শুনুন—

সে আমার কে? যদি কেউ বলে,
উত্তর নাই তার—
জনমে-মরণে, জীবনে জীবনে
উত্তর নাই আর।
তার পরিজন রয়েছে অনেক,
আমারো সকলে আছে,
দু'জনের মাঝে বাধার পাথার,
তবু তো এসেছি কাছে।
তার চলা-পথে এই হাতছানি
হয়তো পেয়েছে সে,
আমার পথেতে তারি যে ইসারা,
তবু সে আমার কে?

"কি সুন্দর কবিতা লেখেন, গৌতম বাবু! গদ্যের চেয়ে কত ভালো! তবু কবি হিসাবে কই নাম আপনার নেই তো? চুপ করলেন কেন? ওই তো কবিতাটা আরো আছে, পড়ুন।"

"পড়বো? শুনবেন?"

"বাঃ, শুনতেই তো এসেছি।"

"শুনতেই এসেছেন? ঠিক। শুনুন শেষ লাইন—

বলিতে পারিনে, এ মনের বাণী
নীরবে অধরে রয়,—
কেউ নয় সে যে, তবু তো ধরণী
আমার সম্পা-ময়।

"সম্পা, সম্পা!......সম্পা!"

"কি?"

"একটু কাছে এসো। একবার। এক সেকেন্ডের জন্যে। ছুঁতে দাও।"

"না।"

"কেন?"

"কেউ দেখবে।"

"কেউ দেখবে না। এসো সম্পা, একটিবার। কাছে এসো।"

"কাছেই তো রয়েছি।"

"না। আরও কাছে এসো। অত দূরে নয়। জোর করবো না। আপনি এসো।"

"না।"

"সম্পা, বেশীক্ষণ নয়, একটুক্ষণ চাই। এসো, একবার এসো।"

"যাচ্ছি।"

উন্মত্ত মাদকতায় সম্পার কতকগুলি দিন কাটিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে ছায়া এ সময়ে পুত্রের জন্মদান করিয়া অসুস্থ ছিল। নইলে, হয়তো চতুর্দ্দিককে লক্ষ্য রাখার ঝোঁকে তার চোখ সম্পার উপরে পড়িত, ধরা পড়িত গোপন প্রেমের কাহিনী। গৃহিণীও ছায়ার অসুখে ব্যস্ত ছিলেন। কদমমণি তৎসহ। এর মধ্যে নিখিলেন্দ্র অমিয়েন্দ্রের পরামর্শে আইন ছাড়িল। এক বছর পড়িলে সে উকীল হইতে পারিত। কিন্তু একটি ভাল চাকরী পাওয়া গেল। সেটি অমিয়ের হাতে। নিখিলের প্রথমে প্রকাণ্ড কল্পনা ছিল। উকীলের পকেটে জমীদারের কত টাকা যায় সে জানে। নিজের সম্পত্তি সে দেখা-শোনা করিতে পারিবে। প্রতিপদে উকীলবাড়ী অসহায়ের মত ছোটছুটি করিতে হইবে না। কথায় কথায় উকীল ডাকিয়া পরামর্শে টাকা জলের মত বাহির হইয়া যাইবে না। তা'ছাড়া, স্বাধীন ব্যবসায়। উকীল সে হইবে নাম-করা। ভবিষ্যতে হয়তো শাসন-পরিষদে ঢোকা

যাইবে। চাইকি আরও কত। কিন্তু এসব স্বপ্ন মুছিয়া নিখিলেন্দ্র বাঁধাধরা কাজ গ্রহণ করিল। এখন কর্ত্তা অমিয়। বড় চাকুরে সে। রায়বাড়ীর প্রথম চাকুরিয়া। জগতে চাকরী ছাড়া কিছু তার নাই। চাকরীই উন্নতির মূল। চাকরীর দ্বারা অবস্থা ফেরানো চলে। তাই, লোভনীয় কর্মটি হাতে পাওয়া মাত্র অমিয়েন্দ্র ভ্রাতাকে প্ররোচিত করিল। নিখিল ভাবিয়া দেখিল, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পশ্চাতে আশায় আশায় ছোটা অপেক্ষা সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনা গ্রহণ শ্রেয়তর। বাঁধাগণ্ডিতে অমিয় ধরা দিয়াছে, মানুষ আজ এ বাড়ীতে অমিয়। তাহার অর্থবল, তাহার কথা সকলে মানে। বাহিরের জগৎ অমিয়ের সহিত অগ্রসর হইয়া রায়বাড়ীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছে। ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান সংগ্রহে অমিয়কে ডাকিয়া লইতেছে। বাহিরের জগৎ এতদিন বিরুদ্ধপক্ষ ছিল। বাহিরে রায়বাড়ী যাইত। কিন্তু, লোভ হইলেও সংগে আনিতে পারিত না। না পারিতে পারিতে চাওয়া মরিয়া গিয়াছিল। চাহিতে তাহারা শেখে নাই। সেই জগতে অমিয়ের দাবী জন্মিয়াছে। অমিয়ের পথ গ্রহণ করাই সমীচীন। নিখিলেন্দ্র তাই সাহেবী ফার্ম্মের কাজটি লইল। রায়বাড়ীর আর একটি সন্তান চাকরীর জোয়াল স্কন্ধে বহিল। এইবার রায়বাড়ীতে অন্য হাওয়া বহিয়া গেল। রাজপুরুষের সংগে অন্তরঙ্গতার ফলে রায়বাড়ীতে একটা বিদেশী হাওয়া বহিত—এক আধটু। এখন সেই আভিজাত্যপূর্ণ হাওয়ার পরিবর্তে বহিল সোজা ইংরাজি অনুকরণ। সম্পূর্ণভাবে রায়বাড়ীকে গ্রাস করিতে না পারিলেও প্রভাব বিস্তর রাখিল। সওদাগরী বিলাতি জগৎ ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল নিখিলেন্দ্রের সঙ্গে বিদেশী শপথ ও বিলাতী নাচের সুরের বেসাতি লইয়া। কিন্তু সে পরের অধ্যায়। এখন সম্পার কথা হোক।

নিখিলেন্দ্র ও অমিয়েন্দ্র ব্যস্ত রহিলেন কর্ম্মক্ষেত্র লইয়া। জয়া ঢিলেগোছের মানুষ, আবার সংসারের ভার স্কন্ধে পড়ায় 'হিম্‌সিম্‌ খাইতে' লাগিল। নিখিলের বৈঠকখানা আসর গড়িয়া রায়বাড়ীতে একটি ছোট ডাল যুক্ত হইল। বিলাতি ফার্মের অফিসর। শীঘ্রই ছোটকর্তার পদে হয়তো উন্নীত হইতে পারে। সমস্ত নির্ভর করিতেছে নিখুঁত সাহেবী ভঙ্গি প্রদর্শনে ও সাহেব কর্তাদের মনোরঞ্জনে। বেয়ারা নিযুক্ত হইল। পোষাকের ভার সে লইল। বন্ধুদের তদারক বেয়ারা করিলেও ধাক্কা লাগিত সাবেকী রান্না ও ভাঁড়ার ঘরে। জয়া আর সংসার ভিন্ন কিছু দেখিতে পারিত না। ভালো মানুষ মেজ বৌ। রায়বাড়ীর দুই অধ্যায়ে দুই জায়ের শাসন পরিক্রমায় তটস্থ। সে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিত না, সন্তানাদি লইয়া ব্যস্ত। মালতী, বিনতার স্কুল খুলিয়া গেল গরমের ছুটির পরে। পরীক্ষা লইয়া তারা

ব্যস্ত। বিনয়ের এবার ফাইনাল। মাথা নাই, অথচ অনার্স আছে। মানরক্ষার ভয়ে মাথা নামাইয়া অহোরাত্র পড়ায় মন দিয়াছে। মহেন্দ্র পাবনায় গিয়াছেন জমিদারী দেখিতে। ছায়া অসুস্থ বলিয়া জয়া সঙ্গে যায় নাই। চপলেন্দ্র সম্প্রতি ব্যবসা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। ছোট দুই ভাই চাকুরী-ক্ষেত্রে নামাতে বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। চপলেন্দ্রের পক্ষে সুবিধাজনক। এতদিন ব্যবসা ছিল যেন নিজেকে লইয়া, এখন ছোট ভাইএরা লোক ধরিয়া সাহায্য করিতেছে। চপলেন্দ্র ব্যবসা বড় করিতেছেন। দেখা যাক কি হয়। স্থবির কর্তা শয্যাতে সময় কাটান। বড় জোর বারান্দায় একটু বসেন। বাকী শ্রীলতা। সে তো তপস্বিনী।

সম্প্রতি রায়বাড়ীর সকলে ব্যস্ত। তাহাদের ইতিহাসে দেখা গেল। তাই, কতকগুলি চমৎকার দিন কাটিল সম্পার লঘু প্রজাপতি ডানায়। বাড়ীতে বলা আছে, সম্পা বই লিখিতেছে—সাহিত্যিক-জীবনী। তাই এত গৌতমের বাড়ী যায় সে যখন তখন। কেউ সন্দেহ করে না। সে-বাড়ী হইতে ফিরিবার পরে সম্পার আনন্দমুখের দিকে কেউ চাহিয়া দেখে না, লক্ষ্য করে না মুখেচোখে নূতন ভাব। গৌতম প্রাণপণ সংযমে গণ্ডি রাখিয়াছে অটুট, কিন্তু প্রথম প্রেম তো! শরীর শরীরের স্পর্শ চায়। সে স্পর্শস্মৃতি পরে মনে স্বপ্ন বোনে।

রায়বাড়ীর দুহিতা তো এমন প্রেম করে নাই পূর্বে। দিদিদের বিবাহ হইয়াছে অল্প বয়সে। তাহারা পরপুরুষের সঙ্গে মিশিলেও দূরত্ব থাকিত। কেউ সাহস করিয়া রায়দুহিতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিত না। রায়দুহিতার মন কাহারও প্রতি পড়িলেও তাই জটিলতার সৃষ্টি হয় নাই। শ্রীলতার প্রেমিক দূর হইতে ভালবাসিত। রায়বাড়ীর জীবনে প্রথম সম্পা বন্ধনহীন, দৈহিক স্পর্শাতুর প্রেমে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার রক্তে রায়-পুরুষদের ঐতিহ্য সুপ্ত ছিল। এখন জাগিয়া উঠিল। বেপরোয়া রায় দুহিতার দুর্বার প্রেমলীলা চলিল গৌতমের স্থিরীকৃত সত্তাকে অস্থির করিয়া, তাহার আত্ম-তৃপ্তির বন্ধন ভাঙিয়া। যতটুকু বাধা সে নিজের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, সমস্ত দুরন্ত দক্ষিণের বাতাসে উড়াইয়া দিল মধুকরী। যা সঞ্চয় ছিল, সমস্ত নিজস্বতা গৌতম বিসর্জন দিল মোহিনী নারীর কাছে। অবুঝ সম্পা বোঝে না পূর্ণ মিলন ভিন্ন প্রেমে সুখ নাই। প্রথমে গৌতমের ব্যাকুল আহ্বানের কাছে ধরা দিয়াছিল সম্পা। এখন সম্পার ডাকে গৌতমকে ধরা দিতে হয়। যখন সম্পার ইচ্ছা তখনই। সম্পাকে ডাকিতে হয় না, নিজের প্রয়োজনে সে দুর্বৃত্ত দস্যুর মত আসে। রক্ষণশীল রায়বাড়ীর দুহিতা। যতটুকুতে দোষ নাই, তাই সে চায়। তোমার যা হয় হোক।

বহুক্ষণ গৌতমের ঘরে থাকে সম্পা। বাড়ীর সকলে চুপ করিয়া না বুঝিবার ভানে থাকে। সম্পা এ বাড়ী আসিলে পারৎপক্ষে কেউ এদিকে আসে না। তবে, এমন বন্য প্রেম গোপনে নাই।

সম্পার গরম লাগে, তাই গৌতম ধার করিয়া পাখা কিনিয়াছে। পাখার বাতাস আছে, কেশ-সৌরভ আছে। বালিশে সম্পার ভিজে চুলের ছাপ পড়ে, শাড়ীর অঞ্চল বাতাসে ওড়ে। তবু স্বপ্নের সে শান্তি তো নাই। কই গৌতমের কল্পলোক? ভালবাসা আসিয়াছে, শান্তি চলিয়া গিয়াছে। জ্বালাময় অসহ এ প্রেম। এর ভবিষ্যৎ নাই, সম্মুখে ব্যথার সিন্ধু। তবু মধুকরী আসিয়াছে। গৌতমের যত মধু আছে, সব তার প্রাপ্য। আদর-আকুলতা দাও, দাও সম্পাকে,—প্লাবিত করিয়া তোল। তারপরে চরম মুহূর্তের পূর্বক্ষণে জলের কলের মত উল্টো মোচড়ে বন্ধ করিয়া দাও শরীর মনের সমগ্র উচ্ছ্বাস। তখন সঙ্গী ও সুহৃদের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। স্নায়ুতন্ত্রী গৌতমের ক্রুদ্ধ অভিশাপ দেয়। গৌতম শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আজও নির্লিপ্ততায় সরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিল সে। চেয়ারে বসিয়া কম্পিত হস্তে সিগারেট ধরাইল। এলোমেলো চুলে ও শ্রান্তির অভিব্যক্তিতে লেখা আছে কিছুক্ষণ পূর্বের তিক্ত মধুর প্রেমলীলার ইতিহাস।

শয্যায় সম্পা শিথিল ভঙ্গিতে অর্দ্ধশয়নে উপবিষ্টা। একটুক্ষণ উস্‌খুস্‌ করিয়া সম্পা ডাকিল, "গৌতম, এখানে এস। কথা আছে।"

"যা বলবার ওখান থেকেই বল।"

"না, এখানে এস। কাছে এস, গৌতম।"

গৌতমের পদনখ পর্যন্ত শিহরণ জাগিল আহ্বানে। তবু, প্রাণপণে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল, "না। বিকেল হয়ে গেছে। কেউ দেখবে।"

"দেখুক না, বয়েই গেল। কি হয়েছে? এসো না তুমি।" গৌতম নিঃশব্দে মাথা নাড়িল। প্রবল বন্যা পরমুহূর্তে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—সম্পার হাতের আলিঙ্গন-ভঙ্গিমায় গৌতমের সিগারেট খসিয়া পড়িল। জোর করিয়া জানুর উপর সম্পাকে বসাইয়া গৌতম চটীর নীচে সিগারেট চাপিয়া ধরিল।

অধর দংশন করিয়া সম্পা বলিল, "গৌতম, এসো। আমার বসে বসে গল্প করতে ভাল লাগছে না।"

"আমি যাবনা।" চুলের সৌরভে আচ্ছন্ন গৌতমের অবচেতন নির্দেশ শোনা গেল।

আলিঙ্গন ছিন্ন করিয়া সম্পা দাঁড়াইল। প্রত্যেকটি শিথিল কেশের অগ্রে অগ্রে তাহার বিদ্রোহ, সংস্কারের বিরুদ্ধে, রায়বাড়ীর বিরুদ্ধে।

কিন্তু? গৌতম অনিবার্যভাবে জানে শেষ কি। তাই সে প্রার্থনার কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সম্পা, যেওনা। কিন্তু, আমি—আমি তো রক্তমাংসের মানুষ। যদি সাহস থাকে, সম্পূর্ণ এগিয়ে এসো। অর্দ্ধেক পথ চলা আমার সহ্য হয় না।"

রায়-বাড়ী প্রতিশোধ লইতে জানে। যে সম্পার রক্তে বিদ্রোহ, সে-ই সম্পার রক্তে রায়বাড়ীর বাধানিষেধের শিকড়। তাই সম্পূর্ণ বিদ্রোহ কোথায়? উদ্দাম রক্তধারা সম্পাকে নিষিদ্ধ পথে টানে—সে অনেক কিছু করে, অনেক কিছু চায়। সে তবু সংস্কার বর্জন করিতে পারে না। রায়বাড়ীর আত্মা তাহাকে ইঙ্গিত দেয়ঃ এইখানে, এইটুকু!

সম্পা কথার উত্তর দিলনা। কিন্তু, চলিয়া যাইতেও সে পারে না। মাথা নীচু করিয়া চৌকির উপর বসিল।

ওই অভিমানটুকু দূর করিবার জন্য গৌতম নিজের আত্মাকেও বিসর্জন দিতে পারে। তুচ্ছ আত্মসম্মান, তুচ্ছ তাহার ভালমন্দের বিচার।

গৌতমের স্থিরীকৃত সত্তাকে অস্থির করিয়া, তাহার আত্মতৃপ্তির বন্ধন ভাঙ্গিয়া বেপরোয়া রায়দুহিতার দুর্বার প্রেমলীলা চলিল।

আট

সম্পা বাড়ীর মত লইয়া গৌতমের সঙ্গে 'শিল্প-পরিষদে' যাইতেছে। জীবন-চরিতে অন্ততঃ লোক-দেখানো প্রথায় কিছু লেখা চাই। বাড়ীর সম্মুখ হইতে ট্যাক্সি লওয়া হইয়াছিল। এখন মধ্যপথে সোডা-ফাউন্টেনে তাহারা নামিয়াছে।

সরবতে চুমুক দিয়া সম্পা বলিল, "কখন যাবে? দেরী হয়ে যাচ্ছে না!"

গৌতম একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছিল, সহাস্যে উত্তর দিল, "যাবোনা। আজ আমার সঙ্গে থাকতে হবে, বুঝেছ সম্পা রয়।"

"ইস্।"

"চিনে বাড়ী ফিরতে পারো? আমি যদি চলে যাই তোমাকে ফেলে?"

"বাড়ী না চিনলেই বা কি? যাও না চলে। আমি ট্যাক্সি ডেকে ঠিকানা দেব।"

"সম্পা, আর বাড়ী ফিরোনা, চলো চলে যাই।"

"কোথায়, গৌতম?"

"যেখানে সব সময় একসঙ্গে থাকা যায়। দিনে রাত্রে সব সময়। সেখানে একটা চেয়ার, একটা গ্লাস, একটা থালা। এমনি করে একসঙ্গে থাকতে হ'বে।"

সম্পা ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, "ছাড়োনা। কেউ দেখবে।"

"কেউ দেখবে এ ভয় আছে তোমার, সম্পা? দেখলেই বা কি? সত্য লুকিয়ে লাভ কি? কিন্তু কথার উত্তর দাও। চল চলে যাই। আর আমি সহ্য করতে পারছি না।"

"যাবো, যাবো গৌতম।"

"সম্পা, ভেবে বলছো? জানো, গরীব হওয়া কাকে বলে?"

"গরীব হবো কেন? তোমার তো নাম আছে। ক্রমেই টাকা হবে। আর, আমিও তো লিখবো।"

"হ্যাঁ, জীবন-চরিত লিখে তোমার অর্থাগমের যে বিপুল সম্ভাবনা আছে, সে কথা তো ভুলে ছিলাম।"

"হাসছো আবার?"

"না, হাসছি না।" গৌতমের লুব্ধ অধর হাসি ভুলিয়া সম্পার অধর নিপীড়নে ব্যগ্র হইল। ক্ষীণ দেহ গৌতমের বক্ষোলীন হইয়াছে। সম্পার দ্রুত নিশ্বাস পড়িতেছিল। এইতো স্বর্গ! রায়-বাড়ীর সীমানার মধ্যে নাই। পথে ঘাটে যখন তখন প্রিয়তমের সাহচর্য। সম্পা পারিবে না, গৌতমকে ছাড়িতে পারিবে না। রায়-বাড়ী রসাতলে যাক।

সম্পার কালোচোখে স্বপ্ন-মাদকতা গৌতম মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, "তাহলে কথা তো ঠিক?"

"হ্যাঁ।"

"ভুলো না, সম্পা। এটা কিন্তু অঙ্গীকার। স্বাক্ষর হয়ে গেল। চল, এবার ওঠা যাক।"

'শিল্প-পরিষদ' ছোট প্রতিষ্ঠান। বাছা বাছা লোক, গায়ক ও শিল্পীতে ভর্তি। সুভদ্রা মিত্র এককোণে বসিয়া ছিলেন। চারিপাশে অনেক লোক তাঁহাব। গৌতম সম্পাকে লইয়া উপস্থিত হওয়া মাত্র সাড়া পড়িয়া গেল। এমন মেয়েতো বেশী আসেনা এখানে। দুরন্ত বসন্তের প্রতিমূর্তি যেন এই কিশোরী। ক্ষণপূর্ণের

উচ্ছৃংখল প্রেমলীলায় মুখ চোখ এখনো সরস তন্ময়তায় দীপ্ত। চোখে আবেশস্বপ্ন, দেহ উৎসুক। সাহিত্যের সংগে কখন বা পাণ্ডিত্য যুক্ত হয়, তাই চশমিত নয়নের ক্ষীণ দীপ্তি দেখিতে এরা অভ্যস্ত। যে সব গণ্ডিচ্যুত নারী এখানে আসেন, তাহারা নিষ্প্রভতার জন্য প্রায়শঃ বিখ্যাত। সহসা বন্য বাতাস ঘরের মধ্যে বহিয়া গেল। সম্পাকে সকলে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। সতরঞ্চ পাতা ছিল মধ্যস্থলে। সম্পা গৌতমের পাশে একধারে বসিল। আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে তাহারা কথাবার্তা বলিতে লাগিল।

"সুভদ্রা মিত্রের বয়স কত, গৌতম? ওঁর কথা বলোনা একটু। দেখতে বেশ লাগে।"

"হ্যাঁ, সুন্দরী না হলেও বিশিষ্টতা আছে। বয়স হয়েছে অনেক—ত্রিশের নীচে হলেও সাতাশ আটাশ তো হয়েছেই।"

"এ তো বেশী নয়। কিন্তু, দেখলে অনেও বেশী লাগে। এতদিন নাম শুনেছি যে, ধারণা ছিল যে উনি বয়স্থা মহিলা। এতো দেখছি ছোটদির চেয়ে, তোমার চেয়েও ছোট। আচ্ছা, মুখের ভাবটায় যেন কি আছে? বয়স বেশী লাগে।"

"খ্যাতির ওই মূল্য, সম্পা। অল্প বয়সে নাম হয়েছে, তাতে মহিলা হয়ে। সুতরাং কতটা মূল্য ওঁকে দিতে হয়েছে, জিজ্ঞাসা করে নিও। অহোরাত্রে শান্তি নেই। বয়স্ক লেখকরা ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে তরুণকে আমল দেন না। তাতে উনি মেয়ে। ওঁকে তো কেউ গ্রাহ্য করতে চায়নি। কতকটা গায়ের জোরে উনি জায়গা করে নিয়েছেন। ফলে, যৌবন-চাপল্য গেছে, মনের নিশ্চিন্ত আলস্য গেছে। সময়ে স্বাস্থ্যও যায়। বয়সের থেকে ওঁকে বড় দেখাবে না?"

"গৌতম, বলনা ওঁর কথা, যা জানো। আমি বাড়ী যেয়ে লিখে রাখবো। ওঁর জীবনী লিখবো, অনেক তথ্য লাগবে। আচ্ছা, ওঁর সংগে মিশবো কি করে? আমাদের বাড়ী উনি যাবেন?"

"ভাল করে বললে যাবেন না কেন? উনি তো আমার মত বুভুক্ষু সাহিত্যিক নন। রীতিমত বড় ঘরের মেয়ে। তুমিও ওঁর বাড়ী যেতে পারো। তোমাদের স্তরের মধ্যেই ওঁর বাস।"

সম্পা চাহিয়া চাহিয়া সুভদ্রা মিত্রের মূল্যবান অথচ সাদাসিদা পোষাক লক্ষ্য করিয়া দেখিল। পায়ের জুতা, মাথার চুলের বিন্যাস, হাতের হীরকাঙ্গুরীয়, গলায় ছোট ছোট মুক্তাগাঁথা হার—সব কিছু সম্পার পরিচিত জগতের সন্ধান দিতেছে। সুভদ্রার দেহ সবল, রং উজ্জ্বল শ্যাম। মুখে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য, যদিও হাসি-কথার

বিরাম নাই। দিদি শ্রীলতার সহিত কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে! শ্রীলতা সুন্দরী, সুভদ্রা সুন্দরী নয়। তবু এক শালীনতা দুইজনের মধ্যে, তাই সম্পা সাদৃশ্য পাইল।

"একটা ছাপ পড়েছে মুখে দুঃখের। ওঁর আর দুঃখ কিসের, গৌতম? দেখতে-শুনতে ভাল। অবস্থা ভালো বলছো, খ্যাতিও হয়েছে। এতে আনন্দ হওয়া উচিত, দুঃখ নয়।

"তা তো বটেই। খ্যাতির সংগে যে অখ্যাতিও থাকে। তুমি তো তা জান না, সম্পা। এদেশে যে মেয়েরা একটু এগিয়ে গেলেই আমরা, পুরুষেরা তার সহ্য করতে পারিনে। পিষে নিভিয়ে দিতে চাই সেই আলোর ফুল্‌কীটিকে। তাছাড়া সুভদ্রা মিত্র তো বিবাহ করেন নি কিনা। তাঁকে পুরুষবিদ্বেষী আখ্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর নায়িকাদের সংগে তাঁর মিল খুঁজে খুঁজে আমরা মরে যাচ্ছি। কাগজে কাগজে ওঁর নামে লেখালেখি। প্রতিপদে সংগ্রাম করতে হয়। বলেছি না, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'।"

তৃতীয় শ্রেণীর চা আসিল। কাপের অবস্থা দেখিয়া সম্পার গায়ের মধ্যে ঘিন্‌ঘিন্ করিয়া উঠিল। নীল বর্ডার আঁকা মোটা কাপ, ময়লা। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এখনি ঠান্ডা সরবৎ খেয়ে এলাম। আর গরম খাবো না।"

গৌতম চায়ের কাপে চুমুক দিয়া বলিল, "মিস্ রায়, রুচিতে বাধছে, না? কিন্তু, একটু আগেই যে অংগীকার করলেন এই জীবন বরণ করে। স্বাক্ষর এখনও ঠোঁটে জ্বলছে।"

সম্পা অপ্রতিভ হইল, "ভারী অসভ্য তুমি!"

"এরা কিছুই মনে করবে না। তোমার বাড়ীতে না বললেই হোল। এখন তো সম্পাদেবীর রামরাজত্ব চলছে। খবরদারিণী মেজবৌদি শয্যাশায়িণী। তা, খাও একটু চা। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা তো আমার কাছে পাবে না। ভাল করে দেখে নাও সম্পা, এই তোমার ভবিষ্যৎ।"

সম্পা মলিন হইয়া গেল। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে তাহার যে ধারণা ছিল তাহা এখানে মুহুর্মুহু পরিবর্তিত হইতেছে। গৌতম যত না কেন তাহাকে মিথ্যা স্বর্গচ্যুত করিতে চাহিয়াছে, ততবার সে গৌতমের কথায় মনে অনাস্থা স্থাপন করিয়া মুখে শিশুর আবদারে বয়স্কের সায়ের প্রথায় সায় দিয়াছে। গৌতমের দারিদ্র্য সত্ত্বেও গৌতমকে দীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। তাহার তারুণ্য আছে, স্বপ্ন আছে, সর্বাপেক্ষা বড় কথা, গৌতমের ভবিষ্যৎ আছে। সাফল্য পাইয়াছে সে।

কিন্তু, আজ দলে দলে ভগ্ন-হতাশ মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি ও শ্রীহীনা নারীদের দেখিয়া সম্পা আশ্বাস পাইল না। অবশ্য উহাদের মধ্যে জীবন-উৎসাহে উদ্দীপিত ব্যক্তির অভাব নাই। কেহ বা সাফল্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সমাহিত ভাব তাঁহাদের। অধিকাংশ লোক কিন্তু অতৃপ্ত। সম্পা গৌতমকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

গৌতম বলিল, "সাহিত্য-জীবনের গোড়ায় প্রত্যেকেরই মনে আশা ছিল দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ হবেন। বিস্ময়ের কিছু নেই। সাহিত্যের জীবন-ধর্ম আশা, স্বপ্ন দেখা। মহত্তর ব্যাপারে সেই আশা ও স্বপ্নকে ব্যক্ত না করে নিজেদের বিষয়ে নিয়োজিত করেছেন এঁরা। ভুল ধরতে পারেন নি। কিন্তু ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে যাচ্ছেন। মন ভেঙে গেছে—সব সময় অতৃপ্তি, হতাশা। কারুর শ্রীবৃদ্ধি সহ্য করতে পারেন না। এই সাহিত্যের আরো একটি রূপ, সম্পা। যাঁরা খ্যাতি পেয়েছেন, তাঁরাও সুখী হন নি কেউ কেউ। মূল্য দিয়ে খ্যাতি কিনতে হয়েছে। যেমন সুভদ্রাদেবী।"

যেমন সুভদ্রা দেবী! অল্প বয়সে খ্যাতির মূল্য মুখে চোখে লেখা। সম্পা গৌতমের সহায়তায় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া লইল। সুভদ্রামিত্র সহাস্যে সম্পার জীবন-চরিত রচনার কথা শুনিলেন। সাগ্রহে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সম্পা ভাবিতে লাগিল। 'শিল্প-পরিষদের' চিত্রখানি জ্বলন্ত বর্ণে চোখের সম্মুখে খেলা করিয়া গেল। অমন পরিবেশে এক মুহূর্ত কাটাইবার কথা সে ভাবিতে পারে না, গৌতমকে ছাড়া। সাহিত্যিক সম্পর্কে সম্পার অসম্পূর্ণ একটা ধারণামাত্র ছিল। সে এক জগতের বাসিন্দা, এরা অন্য জগতের। ভুল বা সন্দেহের প্রশ্ন ওঠে না। সে ইহাদিগকে বুঝিতে পারে না। ইহাদের হাস্য-পরিহাস অথবা কথোপকথনের ভাষা সম্পা জানে না। মুখে যে ইস্পাতের নাল-বাঁধা ঘোড়ার খুর। পাথরের পথে ঘর্ষণে বিদ্যুৎ উদগমের প্রথায় শাণিত বাক্যবিন্যাস ঝলকিয়া উঠিতেছে। বিদ্রূপাত্মক ভাষা নির্ভুল লক্ষ্যে পড়িতেছে লক্ষ্যের উপরে। সম্পা সাহিত্যিক-জনোচিত রমণীয়তা বা হাস্য-বিলাস না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইল। গৌতমের স্ত্রীরূপে এদের সঙ্গে তাহাকে কাল কাটাইতে হইবে। ভাবিতে সম্পা বিপন্ন বোধ করিল। হতাশা সহ্য সে করিতে পারিবে না, সাফল্যহীন জীবনে মহত্ত্ব কোথায়? রায়বাড়ীর সীমানা সঙ্কীর্ণ, সেখানে স্বপ্ন না থাক, হতাশা নাই। সমগ্র মন সম্পার সহসা রায়বাড়ীর পিঞ্জরে প্রবেশ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। চলন্ত বাসে ছুটিতে ছুটিতে মনে হইল গৃহের নিমিত্ত এত ব্যাকুল সে কখনও হয় নাই। যে রায়বাড়ীকে সম্পা অজস্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিয়া সুখী হইত, আজ সেই বাড়ীতে

প্রত্যাবর্তনপূর্বক সেই চিরাভ্যস্ত আলস্যের ক্রোড়ে নিমজ্জমান হওয়া সম্পার একমাত্র মুক্তি। বাসে সম্পা ওঠে না। কদাচিৎ এক আধবার স্কুল হইতে গিয়াছিল। বাসের নূতনত্ব মন্দ না লাগিলেও লোকের ভিড়ে সম্পা উত্যক্ত হইয়া উঠিল।

একটা বড় ঝাঁকুনীতে সম্পা গৌতমের গায়ের উপর পড়িয়া গেল। গৌতম পাশেই বসিয়াছিল। সম্পাকে সাদরে একহাতে জড়াইয়া ব্যগ্র প্রশ্ন করিল, "তোমার লাগলো?" মুহূর্তে প্রিয়স্পর্শে সম্পার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সমস্ত সংশয়, বিক্ষোভ অন্তর্হিত হইল। জগতের অসঙ্গতি এক পলকে ডুবিয়া গেল। শুধু রহিল গৌতম, গৌতমের স্পর্শ। সম্পা স্বর্গ চায় না, সম্পা চায় এই দীন সাহিত্যিককে। রায়বাড়ীর নিয়মের ছক হইতে মুক্তি চায় সে সাহিত্যের সীমানায়। যত হতাশা থাক না কেন সাহিত্য জীবনে, গৌতমের রচনায়; সম্পা জানে আশাও আছে হতাশার পশ্চাতে। যে নিতে জানে সে পায়। গৌতমকে ভিন্ন যে দিন চলিবে না, সে দিন ভিন্ন জগতে গড়িয়া তুলিতে হইবে সম্পাকে। সাহিত্যের মধ্যে কিছু আছে কি না আছে, সম্পা জানে না। তবু অন্ধ আকর্ষণে সাহিত্য তাহাকে টানিয়াছিল। কেন? এই আজ তাহার জীবনের নূতন সুর দিবার উদ্দেশে গৃহছাড়া করিয়া তাহাকে কেন সাহিত্যিকের বাহুবন্ধনে বাঁধিবার আশয়?

নয়

ছায়া ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইতেছে। ছায়ার শিশুপুত্রটিও দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। কদমমণি ছেলের ভার লইয়াছেন। ছায়ার অসুখের সময়ে দেখাশুনা করিবার কালে নূতন নাতিটি রায়-গৃহিণীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছে। তিনিও খবরদারী করেন। শুষ্ক মনে তাঁহার বাৎসল্যের নির্ঝর নামিয়া কিঞ্চিৎ সরস হইয়াছে। ছায়া এখন দোতলায় হাঁটিয়া বেড়ায়।

সম্পার পরীক্ষার ফল বাহির হইল। সম্পা কৃতিত্ব না দেখাইতে পারিলেও উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ স্থির করা প্রয়োজন। মহেন্দ্রও ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আজ সন্ধ্যায় ছায়ার ঘরে আসর বসিয়াছে চা-পানের পর। ছায়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছে যথারীতি। ছায়া বলিল, "সম্পা তো পাশ করলো। এবার কি করা হবে?"

অমিয় চিন্তিত হইলেন। সম্পূর্ণ বাড়ীটির দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে, কারণ মহেন্দ্র কিছু দেখাশোনা করেন না এ বাড়ীতে এখন। মতামত চাহিলে নির্লিপ্ত ঔদাস্যে বলেন, "আমি আর কি বলবো? তোমরা যা ভাল বোঝ করো। এতদিন তো আমি বলেছি, এখন তোমাদের বলার পালা।"

জমিদারী-সংক্রান্ত কাজকর্ম এখনও মহেন্দ্র দেখেন। কিন্তু রায়বাড়ীর এ-যুগে ভূমি পশ্চাদাপসরণ করিয়া স্থান দিয়াছে গোলামীর কাঁচা টাকাকে, বিদেশীর অনুকরণে। সে অনুকরণের জয়ধ্বজা সর্বত্র উড়িতেছে।

নিখিলেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "সম্পাকে বেশী পড়িয়ে ফল কি? ওর তো মাথা নেই। দিনরাত সাহিত্য সাহিত্য করেই মরছে মেয়েটা। পড়ায়ও মন নেই। আমি বলি কি ওর বিয়ে দেওয়া যাক।"

জয়া বলিল, "বিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু বড় রাজকন্যা রয়েছেন যে। আগে ওঁর দিয়ে দাও। নইলে, এ বাড়ীতে বড়কে রেখে ছোটকে দেওয়া চলবেনা।"

অমিয় তাড়াতাড়ি বলিল, "শ্রীলতার বিয়ে? অসম্ভব।"

জয়া বলিল, "বয়স গেছে মানি। তবু ভূত ভবিষ্যৎ দেখতে হবে তো? দোজবরে, বা বেশী বয়সের লোক ধরে দিলেই হয়।"

নিখিল বিরক্ত হইল, "বড়বৌদি, ভুলে যাবেন না শ্রীলতার মত মেয়ে সাধারণতঃ পাওনা যায় না। তাকে যার তার হাতে ধরে দেওয়া আমার মত নয়। সম্পার বিয়ে দেওয়া চাই, সুতরাং শ্রীলতাকে তাড়াতাড়ি বিদায় কর—কথাটা ভাল শোনায় না।"

অমিয় নিত্য কৃতজ্ঞচিত্তে দীপংকরকে স্মরণ করে। দীপংকর তাহার উপকারী শুধু নয়, পরম বন্ধু। দীপংকরের মুখ চাহিয়া শ্রীলতাকে রাখা তাহার ইচ্ছা। কিন্তু অমিয় জোর করিয়া কিছুই বলিতে পারে না, কারণ এতদিনে দীপংকরের মনের পরিবর্তন হইয়াছে কি না কে জানে? প্রত্যাখ্যাত হইয়া সুদূর বর্মায় দীপংকর কি করিতেছে তাহাও অমিয় জানে না। মুখে খঞ্জ আপত্তি দেখাইয়া অমিয় বলিল, "শ্রীলতার বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে লোক জানাজানি হয়েছে। ওর বয়েস যথেষ্ট হয়ে গেছে। অমন মেয়েকে যার তার হাতে ফেলে দেওয়া চলবে না। এক টাকা দিয়ে বিয়ে! টাকা অত কোথায়? এখন আমরা খরচ-পত্র করে বিয়ে দিতে পারলেও, টাকার লোভ দেখিয়ে মেয়ে পার করবার টাকা খরচ করতে পারবো না।"

বিনয়েন্দ্র চুপ করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "এই রকম আলোচনায় রাঙাদিকে শুধু অপমান করা হচ্ছে। দীপংকরদা যদি ফিরে আসেন, তবেই রাঙাদির

বিয়ে হবে, নইলে হবে না। এতো সাদা কথা। এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা কেন? বড় বৌদি এমন ভাবে কথা বলছেন যেন রাঙাদি আমাদের গলগ্রহ। এখনও রাঙাদির বাবা বেঁচে, সম্পত্তি এখনও আছে। টাকার লোভে যে বিয়ে করতে আসবে, তার হাতে বোনকে দেব কেন?"

বিনয়ের কথায় অমিয় আরাম পাইল। সত্যের সহজ রূপটি বিনয়ের চক্ষে ধরা পড়িয়াছে। দীপঙ্করের সহিত শ্রীলতা ধর্মের অলিখিত আইনে যে বাগদত্তা, এ কথাটা তাহারা ভুলিয়াছিল কেমন করিয়া? নিখিলেন্দ্র ছোট ভাই বিনয়ের সহসা-উদ্ভূত তেজপ্রদর্শনে বিস্মিত হইল। জয়া কিন্তু অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। খোঁচাটা লাগিয়াছে তার। জয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সবেগে বলিল, "শোন কথা! আমি ভালোর জন্যে কি বললাম, কি অর্থ হোল? তোমাদের কথার মধ্যে আসাই আমার অন্যায় হয়েছে। উনি বারবার বলেন 'ছেলে-ছোকরার কথায় থেকো না।' তা' আমি কেন মরতে এসেছিলাম এখানে? ঘাট হয়েছে। যাচ্ছি।" ছায়া খাটে বসিয়া সন্তানের গায়ের উলের জামা বুনিতেছিল, উল-কাঁটা ফেলিয়া প্রস্থানোদ্যতা জয়াকে তোয়াজ করিল, "দিদি, যেও না বোসো।"

জয়া কথা কানে না তুলিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া গৃহিণীর মহলে চলিয়া গেল। উদ্দেশ্য, গৃহিণীকে শোনান যে বড়কে রাখিয়া ছোটকে বিবাহ দিবার অধর্মের পরামর্শ তাঁহার আধুনিক ছেলে-বউ করিতেছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ গৃহিণী কর্তার কাছে নবজাত নাতিকে কোলে লইয়া রঙ্গ-রস করিতেছিলেন। জয়া বলিতে পারিল না। অগত্যা কদমমণির নিকট সবিস্তারে অমিয় প্রমুখ সকলের অনাচারের কল্পনা-কাহিনী ব্যক্ত করিয়া জয়া মনোভাব লঘু করিল। কদমমণি গালে হাত দিয়া ছড়া কাটিলেন:—

"ছাউ কর্তা, বৌ গিন্নী, (ছো কর্তা ও বৌ গিন্নী যে সংসারে, সে সংসারে মৃত্যুর চিহ্ন)
সে সংসারে মরার চিন্নি।"

এঘরে অমিয় বলিল, "বড় বৌদি অযথা রাগ করলেন।"

নিখিল বলিল, "ভালোই হোল। উনি, বড়দা যেন আদি যুগে বাস করছেন। বড়বোন মত দিলে ছোটর বিয়ে দেওয়া চলে। শাস্ত্রে আছে, আমরাও তাই করবো। তা, সেজবৌদি, কি বল? সম্পার বিয়ে দেওয়া যাক।"

ছায়া উল বুনিতে বুনিতে নত নেত্রে বলিল, "আমি তো পাত্রও দেখে রেখেছি।"

নিখিল হাততালি দিল, "বাঃ, বাঃ! আমরা হেঁটে চললে উনি চলেন দৌড়ে। কে?"

"তোমার বন্ধু রঞ্জিৎ। কত বড় চাকুরে!"

নিখিলেন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিল। নূতন কার্যস্থলে নূতন বন্ধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রঞ্জিত চক্রবর্তী। প্রত্যহ প্রায় এ বাড়ীতে আসে। ছায়ার সহিত সুমধুর দেবরের সম্পর্ক পাতাইয়াছে। রঞ্জিত নিখিলের উপরে কাজ করে। যথেষ্ট উপার্জন তাহার। শিক্ষিত ভদ্রঘরের সন্তান। "ওর বংশটা কি ভালো?"—অমিয়েন্দ্র চিন্তিত হইলেন।

"খারাপ কি? বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তো। রাঢ়ী তো নয়। কলকাতা রাঢ়ী ব্রাহ্মণে ভরে গেছে।"—ছায়া উত্তর দিল।

বিনয় বলিল, "বড় চাকুরে, কিন্তু ঘর দেখবে না তোমরা?"

"ঘর ধুয়ে জল খাবো? তোমাদের তো ঘরে কুললো না। একের পর এক ভাই চাকুরী নিলে। চাকরী ছাড়া উন্নতি অসম্ভব। চাকুরে দেখে দেওয়াই ভালো।" উলের ঘর গুণিতে গুণিতে ছায়া বলিল, "সম্পার সঙ্গে ছেলেটিকে বেশ মানাবে। মনে হয়, সম্পাকে রঞ্জিতের পছন্দ আছে।"

"সম্পার পছন্দ আছে কি?" নিখিল প্রশ্ন করিল।

"সম্পার আবার পছন্দ অপছন্দ! নেহাৎ ছেলেমানুষ, পাগলী একটা। মুখে যত দাপাদাপি করুক, ভালোমন্দের জ্ঞান হয়নি।"

ছায়ার কথায় সম্পার পিঠোপিঠি ভাই বিনয় খোঁচা দিল, "শ্রীমতী সম্পা যে মস্ত সাহিত্যিকা হচ্ছেন, জানেন না? দিনরাত গৌতম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী। লেখকদের জীবন-চরিত লিখে যশস্বিনী হবেন।"

অমিয় হাসিল, "তাই বেশভূষায় অবহেলা, উড়ুউড়ু ভাব। বোহেমিয়ান হওয়া চাই কিনা।"

ছায়া বলিল, "না, এ ভাল নয়। সংসারে শেষে মন বসবে না। তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিয়ে ফেলি। বাবা-দাদার সঙ্গে পরামর্শ করো তুমি কালই।"

"কিসের পরামর্শ, সেজবৌদি।" আলু-থালুবেশা সম্পা দাঁড়াইল। পাশের বাড়ীর দুরন্ত প্রেমলীলার আতিশয্যে বক্ষ তোলপাড় করিতেছে তখনও। আজকাল সে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে না। নেহাৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াই আসিয়া পড়িল গৌতমের নিকট হইতে ফিরিবার পথে।

নিখিল তাড়াতাড়ি ছায়ার হইয়া উত্তর দিল, "এই, তোমার বোহেমিয়ান ভাবটা কাটিয়ে দেবার পরামর্শ। আজকাল আবার যুটেছেন উপযুক্ত গুরু—সুভদ্রা মিত্র। দুই চারবার দেখাতেই সম্পা বিগলিত হয়ে পড়েছে।"

"কেন হবোনা শুনি? তুমি ওঁকে দেখনি তাই। তাহ'লে তুমিও হ'তে, রাঙাদা।"

"মাপ করো।" নিখিল হাত যোড় করিল।

"দেখতে একদিন তোমাকে হবেই। আর আমি বোহেমিয়ান হ'লে তাতে তোমাদের কি? আমার জীবন আমারই। যা খুসী তাই কোরবো।" সম্পা চলিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

ছায়া ক্রমে সুস্থ হইতেছে। ডাক্তার তাহাকে পদচালনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সুতরাং ছায়া লম্বা বারান্দায় পায়চারী করে। কয়েকদিন পরে আজ ছায়া ছাদে উঠিয়াছে। প্রকান্ড রায়বাড়ীতে ছাদের মূল্য কেউ দেয় না। ছায়া ছাদে ওঠে না। ডাক্তারের পরামর্শে বাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। লম্বা পদচারণ হইবে। ছায়া নানা কথা ভাবিতেছিল। বিরাট রায়বাড়ীর সমস্ত সমস্যার মীমাংসা ছায়া না করিলে কে করিবে? ইহারা কেহ চিন্তা করে না। কর্তা-গৃহিণী সংসারের প্রায় বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্র, জয়া নির্বিকার। চপলেন্দ্রের দল নির্বিরোধী। অমিয়, নিখিল কাজে ব্যস্ত। বিনয়, সম্পা প্রভৃতি সকলেই ছেলেমানুষ। শ্রীলতা উদাসীন। গোটা দায়িত্ব সুতরাং ছায়ার স্কন্ধে। কেউ কিছু না করিলে, না ভাবিলে চলিবে কেন? ছায়ার অসুখের মধ্যে রায়বাড়ীতে আবার বিশৃংখলা আসিয়াছে। এখন ধীরে ধীরে সংসার সাজাইয়া তোলা দরকার। ছায়ার কত কাজ! তার উপরে সন্তান মানুষ করা আছে। এখন ছেলে ছোট, তাহাকে শিক্ষা দিবার প্রশ্ন ওঠে না, মানুষ করিয়া যাইতে হইবে। তবু গৃহিণী ও কদমমণি বাচ্চাটার ভার গ্রহণ করাতে ছায়া হাতে সময় পায়। এইবেলা এলানো সংসার আবার গুছাইয়া লওয়া প্রয়োজন। আবার তো ছেলে বড় হইলে তাকে লইয়া পড়িতে হইবে। এত কাজ ছায়া একা পারে না। তবু, ছায়া না করিলে কে করিবে? নিজের ভালমন্দে এরা সবাই উদাসীন। শ্রীলতা তো, কদমমণির ভাষায় 'ন দেবায়, ন ধর্মায়' হইয়া থাকিল। সম্পার পাত্র হাতের কাছে উপস্থিত। ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। সম্পা ক্রমেই বহিয়া যাইতেছে। দিনরাত কী এক্ ভাবে থাকে মেয়েটা, বাড়ীর লোকের সংগে কথাবার্তা বলে না। সুভদ্রা মিত্রের বাড়ী মাঝে মাঝে যায়। তিনিও একদিন আসিয়াছিলেন:

সুভদ্রা মিত্রের সাহচর্যে অবশ্য আপত্তি করা চলে না। তিনি বড়ঘরের মেয়ে. যশস্বিনী লেখিকা। কিন্তু, পাশের বাড়ীর গৌতমকে লইয়া সম্পা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেছে। দিনরাত সেখানে যাওয়া চাই। কি এক বই লিখিতেছে। অবশ্য, গৌতমের সাহায্য ভিন্ন লেখা চলেনা। কিন্তু রোজ কি যাওয়া উচিত? এধারে রঞ্জিতের সঙ্গে তো মেলামেশা দরকার। সম্পাকে ছায়া পাইবে কোথায়? সর্বদা উধাও সম্পা! বেশভূষায় মন নাই। মেয়েটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে! সম্পাকে সায়েস্তা না করিলেই নয়।

চিন্তামগ্না ছায়া আলিসার পাশে আসিল। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সে শিহরিয়া উঠিল। ওঃ, একি, একি! রায়বাড়ীর দুহিতা, অভিজাততনয়া সম্পার এই পরিণাম? ছাদের এই অংশ হইতে সোজাসুজি দেখা যায় গৌতমের ঘর, পাশের বাড়ীর একাংশ। জানালায় পর্দা থাকিলে ঘরের অভ্যন্তর দেখা যাইত না। কিন্তু, পরদা ময়লা হওয়াতে গৌতমের নির্দেশে সাবান কাচিয়া মেলা হইয়াছে। ভারী খদ্দরের পরদা সারাদিনে শুকায় নাই। দ্বিতীয় সেট থাকিলে এ অঘটন ঘটিত না। ছায়া দেখিতে পাইত না। কিন্তু দরিদ্র গৌতমের আর পরদা নাই। এখানেও গৌতমের দারিদ্র্য তাহাকে ধরাইয়া দিল। সম্পার প্রেমলীলা ছায়ার চক্ষে ধরা পড়িয়া গেল। অতর্কিত মুহূর্তে।

দশ

সম্পার সংকল্প শুনিয়া বহুদিন পরে রায়-বাড়ী বিচলিত হইয়া উঠিল। প্রাচীন বনেদের পাকে পাকে চিহ্ন ছিল অনাচারের, বিদ্রোহের। একাধিক দৃষ্টান্ত লেখা ছিল ইঁটকাঠের ফাঁকে ফাঁকে হৃদয়-বৃত্তির আতিশয্যের। কিন্তু, সে তো কল্পান্ত পূর্বে, নয় কি? তা-ও বিদ্রোহ করিয়াছে রায়-পুরুষ। নারীবিদ্রোহ এই প্রথম। কিন্তু, ভাবিয়া দেখিলে বীজ বহুপূর্বে রোপিত হইয়াছে শ্রীলতার বিদ্রোহে। মনোনীত পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করা রায়-দুহিতার পক্ষে সমীচীন নয়। তবু, শ্রীলতার ক্ষেত্রে রায়-বাড়ী এত বিচলিত হয় নাই। কারণ, শ্রীলতার ব্যবহার যেন কোথাও গতানুগতিকের লতা-সূত্রে গ্রথিত ছিল। কন্যা পাত্র মনোনয়নে নিজ রুচি দেখাইয়া রায়-বাড়ীকে সম্মানই দিয়াছে। সংস্কৃতির অভাব পাত্রের, অভিজাততনয়ার চক্ষে বিসদৃশ লাগিয়াছিল। রায়-বাড়ী ক্ষুব্ধ হইলেও ভিতরে ভিতরে দুহিতার উচ্চ পছন্দের তারিফ করিয়াছিল। শ্রীলতার সাময়িক চাকরী যেন মনোহব

অভিমান মাত্র, বিদ্রোহ নয়। শ্বশুর-বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে পলায়ন, অথবা পিত্রালয় হইতে শ্বশুর-বাড়ী অভিমানে গমন। গোসাঘরে খিল দেওয়া, আর কি। রায়-বাড়ী অপমানিত বোধ করিলেও নিশ্চিন্ত ছিল। ব্যাঘ্রের প্রত্যাশায় থাবা মেলিয়া হাঁ করিয়া পলায়নপরাকে লক্ষ্য করিতেছিল। কোথায় যাইবে কবলগত শিকার? দুদিনের পলায়ন মাত্র। ফিরিয়া আসিবে সে নিরন্ধ্র আরামের কবলে। সত্যই শ্রীলতা ফিরিয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু, তখন রায়-বাড়ী সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বোঝে নাই। শ্রীলতার ক্ষণ পলায়ন যে সম্পার প্রকাশ্য বিদ্রোহের অগ্রদূত, তাহা জানিলে রায়-বাড়ী অবশ্যই চিন্তিত হইত। কালবৈশাখীর মেঘ শ্রীলতার আকাশে দেখা দিয়াছিল। সেই মেঘখণ্ড চূড়ান্ত বিবর্তনে সম্পার আকাশে বজ্র-বিদ্যুৎ আনিয়াছে।

রায়-গৃহিণী কিন্তু আশ্চর্য করিয়া দিলেন, "এমন জামাই হ'লে আমার কোন আপত্তি থাকতো না। সম্পা মন্দ পছন্দ করেনি। ছেলের কৃতিত্ব আছে। গরীব হ'লেও গুণী ওরা। আমার বাড়ীতে অমন ছেলে একটিও নেই।"

জয়া খন্‌খন্‌ করিয়া বলিল, "মা, সত্যি বলছেন? ও যে রাঢ়ী বামুন। ওঘরে তো বারেন্দ্রের মেয়ে যায়না। কুলগৌরব আমাদের যাবে কোথায়? তাছাড়া ওরা কোনদিকে সমকক্ষ ঘর?"

গৃহিণীর সূক্ষ্ম অধরে বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া গেল। বধূ আসিয়াছে হতদরিদ্রের ঘর হইতে। তিনি বহুদিনে এ বাড়ীর একজন হইয়া গিয়াছেন। বধূ হইতে পারে নাই, তাই দরিদ্রকে এত ঘৃণা। তিন বিবাহিতা দুহিতার কথা মনে পড়িল। কেউ সুখী নয়। অর্থ ও বংশের নিকট মনের সুখ বাঁধা দিয়া লোকচক্ষে সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছে। বড় মেয়ে ললিতা বুড়ো কর্তার আমলে স্কুলে পড়িয়াছিল। সদ্য আগত আধুনিকতার হাওয়ায় মানুষ সে। পাশের বাড়ীর গরীব স্কুল-মাষ্টারের ছেলে প্রভাসকে ললিতা পছন্দ করিয়াছিল। মাতা জানিলেও অন্য কেউ জানে নাই। মাতা গোপনে রাখিয়াছিলেন। কন্যাকে শাসন করিয়া মনের অসংযমকে দমন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। প্রভাসের সহিত বিবাহ সম্ভব নয়। কুল-মর্যাদায় সমান হইলেও প্রভাস অর্থে সমান নয়। রায়-দুহিতা যাইবে অভিজাত ঘরে—ভূস্বামীর সংসারে। ললিতার তৎক্ষণাৎ বিবাহ দিতে গৃহিণী বুড়ো কর্তাকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। ধনীতনয় কন্দর্পকান্তি বড় জামাই। কিন্তু, মেয়ের সুখ হইল কই? আজও ললিতা মাতার বিরুদ্ধে রোষ পোষণ করে নীরবে। গৃহিণী

তাহা জানেন। প্রভাস এখন আর দরিদ্র নয়—নাম-যশ-অর্থ সব হইয়াছে। এখন প্রত্যাখ্যাত প্রভাস ললিতার স্বামী অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেয়তর। কিন্তু, গৃহিণী তো তখন তাহা বোঝেন নাই। দৃষ্টিগোচর তমসায় বহুদূরব্যাপী আলোকশিখা সুপ্ত থাকে, রায়-গৃহিণী তাহা তো জানিতেন না। তাই হিসাবে ভুল হইয়াছিল। এখন অনুশোচনা হয়। অন্য মেয়েরাও সুখী নয়। কুমারী শ্রীলতাও অসুখী। এখন দুরন্ত-ছন্নছাড়া সম্পা নিজের জীবনে যে জট ফেলিল, তাহাতেই বা সুখের আশা কোথায়?

বিষণ্ণ চিত্তে গৃহিণী চিন্তা করিলেন, তাঁহার কন্যারা এত অসুখী হয় কেন? গৌতমকে চায় সম্পা, যেমন ললিতা চাহিয়াছিল প্রভাসকে। কন্যারা গুণবাহুল্যে পাত্র মনোনয়ন করে দেখা যাইতেছে, ধনপ্রাবল্যে নয়। তাইতো রায়-বাড়ীর পরিকল্পনার মধ্যে তাদের সুখের মূল্য থাকে না। নিজের সন্তানেরা কেউ কৃতী কি? বড় চাকরী করিলেও বা যশ কোথায়? কেউ তো নাম জানেনা তাদের। অথচ, গৌতম নিজের লেখনীবলে জগতে স্থান করিয়া লইয়াছে। কে জানে, ভবিষ্যতে এই ক্ষুদ্র চারাগাছ মহীরুহ হইবে কি না? ললিতার জীবনে ভুলের ফসল রোপণ করিয়া আর তো মাতা কন্যাদের বিবাহ ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত নয়। তবে, গৌতম যে রাঢ়ী শ্রেণী। বারেন্দ্র-রাঢ়ীতে বিবাহ হইলেও রায়-বাড়ীতে চলিতে পারে না। না, কোন পথ নাই। রায়-গৃহিণী বংশ-মর্যাদা বিসর্জনে সাহায্য করিতে পারিবেন না। রায় হাড়িকাঠে আবার বলি পড়িবে।

ছায়া বলিল, "গুণ আর কি। পেটের দায়ে বই লিখে বেচে। দেখতেও তো ভাল নয়। কালো! সম্পার সঙ্গে মোটেই মানাতো না। বারেন্দ্র হলেও। রঞ্জিতের পাশে দাঁড়াতে পারে না।"

শ্রীলতা ধীরে ধীরে বলিল, "গরীব হওয়া বড় কষ্ট। সম্পা পারবে না।"

উত্তেজিত ভাবে মহেন্দ্র অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। এখানে-ওখানে ছোট ছোট দলে রায়-বাড়ী সম্পার অবিমৃষ্যকারিতা সম্যক আলোচনা করিয়াছে। মাতার সন্নিকটে সকলে উপস্থিত হইল। ভাসুরকে দেখিয়া ত্রস্ত ছায়া গৃহিণীর কক্ষ হইতে বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতে মহেন্দ্র উদার ভাবে বলিলেন, "না না, সেজ বৌমা, আপনি বসুন। আপনার তো বুদ্ধি যথেষ্ট আছে। সংসারটাই চালাচ্ছেন আপনি। দেখুন তো কি বিপদ হোল।"

ছায়ার মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। এটুকু প্রাপ্তি বাকী ছিল। অহোরাত্র খাটিয়া মরিয়াছে সে, নিজের বলিয়া কিছু রাখে নাই। রায়-বাড়ী অনিচ্ছুক

প্রশংসায় ছায়াকে ধন্য করিলেও বড় ভাসুর কখনও ছায়াকে সমর্থন করেন নাই। অন্ততঃ, তাঁহার নীরব গাম্ভীর্য তাহাই বোঝাইত। আজ বিপদের মুহূর্তে রায়-বাড়ী একত্রিত হইয়াছে। নিজেদের ছোটখাটো অন্তর্লীন বিরোধ সংযত করিয়া বহিঃশত্রুর বিপক্ষে তাহারা সমস্ত শক্তি সংহত করিয়াছে। মহেন্দ্র বিপদকালে অভিজ্ঞ সেনাপতির ন্যায় অধীনস্থ সেনাদলের তুষ্টি বিধান করিতেছেন। উদার-চিত্তে প্রশংসা করিলেন তাই ছায়ার, যে ছায়ার প্রাধান্যে তিনি ও স্ত্রী গদীচ্যুত হইয়াছেন।

ছায়া এক মুহূর্তে কৃতার্থ হইয়া গেল। সম্পার জীবনে প্রমাদ আসিয়াছে তাহা হইলে ছায়াকে শেষ প্রাপ্তি দিতে? মহেন্দ্রের মুখের এ প্রশংসাটুকু ছায়ার সুখের পূর্ণ পাত্রে শেষবিন্দু সুধা।

অমিয় বলিল, "বাবাকে এখনও বলা হয়নি। আমরা মোটামুটি যুক্তি-বুদ্ধি করে যা হয় ঠিক করে জানাব।"

জয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক করবার তো কিছু নেই, বেঠিক করবার কথাই তো। ওইটুকু মেয়ে প্রেম-ভালবাসা কি বোঝে? অবাধ মেলামেশার ফল, আর কি। সবাই ছেড়ে দিয়ে রাখলে। অষ্টপ্রহর একজন সোমত্ত ছেলের সঙ্গে মাখামাখি করলে তো এমনি হবেই। খাল কেটে কুমীর তো আমরাই আনলাম, গৌতমবাবুর লেখার ভক্ত হয়ে। যখনি সম্পা সাহিত্য সাহিত্য করছিল তখনি বোঝা উচিত ছিল অঘটন ঘটবে।"

জয়ার বাক্যাবলী চিরকাল অসংস্কৃত। এখন কেউ কিছু মনে করিল না। আশ্চর্যভাবে জয়া ঠিক কথা বলিতেছে। মোট কথাটা তাহার মোটা মনে ধরা পড়িয়াছে। রায়-বাড়ীর সূক্ষ্মতায় যাহা সংগত, লৌকিক আচারের স্থূলতায় তাহা অসংগত। জয়ার কথাতে তাই মনে কিছু করা চলে না।

নিখিল বলিলেন, "সম্পাকে ডেকে তার বক্তব্যটা শুনে ওকে বোঝানো উচিত।"

বিনয় বলিল, "জোর করে তো কিছু করা চলবে না। সম্পা সাবালিকা।"

অমিয় বিরক্ত হইল, "জোর করলে লোক জানাজানি, কেলেংকারী হবে মাত্র।"

চপলেন্দ্র ও শ্রীলতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। চপলেন্দ্র কৃতী নন। ভাইদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতি হইলেও এখনও নিজের সন্তানসহ তিনি রায়-সম্পত্তির গলগ্রহ। গলার জোরে মতামত দেওয়া তাঁহাকে সাজেনা। শ্রীলতা অপরাধিনী নিজে। অন্যের অপরাধের বিচার তার শোভা পায়না। চারি-

দিকের সবাক নিন্দা, সমালোচনার মধ্যে তাই দুই ভাইবোনে নীরব রহিল। চপলেন্দ্রের স্ত্রী নিজের পুত্রকন্যা লইয়া বিব্রত। এ সন্ধ্যা-আসরে তাঁহার আগমন সম্ভব নয়।

মহেন্দ্র বলিলেন, "ঝোঁকের মাথায় বলছে পাশের বাড়ীর ছেলেকে বিয়ে করবে। এ বিয়ে সম্ভব নয়। ওকে ডাক। বুঝিয়ে দিচ্ছি। সাহিত্য-কবিতা ওর সর্বনাশের মূল। গোড়াতে বাধা দেওয়া উচিত ছিল।"

নিখিলেন্দ্র বলিল, "ওর রঞ্জিতের সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে ফেলা যাক। সে রাজী আছে।"

অমিয় হাসিল, "আগে এ বিয়েটা ভাঙ তো। তারপরে অন্য বিয়ের চিন্তা কোর।"

সম্পা গৃহে প্রবেশ করিল দাদাদের আহ্বানে। উদ্ধত বিদ্রোহ মুখে চোখে লেখা থাকিলেও ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত গতি তার। শ্রীলতা করুণ দৃষ্টিতে চাহিল, আহা, সম্পা কত রোগা হইয়া গিয়াছে এই দুইদিনে! কেন তাদের জীবনে সমস্যা আসে? প্রেম, বিবাহ এসব বাদ দিয়া কি নারী-জীবন চলেনা?

"বোস, সম্পা। আমরা তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।" সকলের নীরবতার মধ্যে মহেন্দ্রের কণ্ঠের আদেশ অস্বাভাবিক কঠোর শুনাইল।

"সম্পা, শোন সেজ-বৌমার কাছে তুমি দুদিন আগে যা বলেছ, আমরা শুনেছি। জেনে রেখ, তা সম্ভব নয়।" মহেন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন, "তুমি কোন বাড়ীর মেয়ে, তা কি ভুলে গেছ? তোমার বংশমর্যাদা জলাঞ্জলি দিতে চাও? বাবাকে এখনো আমরা এ কথা জানাতে সাহস পাইনি। তোমার কথা শুনলে এই শরীরে তাঁর সহ্য হবে না। কি করে তুমি এমন কথা বলতে পারলে, সম্পা? বাবার কথাও ভেবে দেখলে না? তুমি কি নিজের বাবার মৃত্যুর কারণ হতে চাও?"

নিখিল সম্পার বিবর্ণ, বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে বলিল, "বড়দা, সম্পা নিশ্চয় ঠাট্টা করে বলেছে ওকথা। এত গুরুতরভাবে তোমরা নিচ্ছ কেন?"

ছায়া বলিয়া উঠিল, "তা হলে তো মিটেই গেল। আমি বৌদি হই, আমার সঙ্গে তো ওর ঠাট্টার সম্পর্কই। চল্ সম্পা, হাসি তামাসার কথা মিটে যাক। আমরা চলে যাই।"

ছায়ার বাহুর আকর্ষণকে সবলে প্রতিহত করিয়া সম্পা বলিয়া উঠিল, "ঠাট্টা নয়। আমি সত্যি কথাই বলেছি।"

অমিয় তাড়াতাড়ি বলিল, "সম্পা, ভেবেচিন্তে কথা বলো। বড়দাদাদের সম্মুখে তোমার এ নির্লজ্জতা শোভা পায় না। তোমার বিয়ের কর্তা কি তুমি?

এইটুকু মেয়ে, কি জান, কি বোঝ? আমরা তোমার ভালো চাই। আমরাই তোমার ভবিষ্যৎ দেখে দেব, যাতে তুমি সুখী হতে পার। চাল-চুলোহীন হতদরিদ্রকে বিয়ে! কাল হয়তো দাঁড়াবার জায়গা ওর থাকবে না, জান? ওই বাড়ীতে পারবে থাকতে? এক আধদিন নয়, দিনরাত। ওইভাবে কখনো থেকেছ তুমি, থাকতে পারো? ভেবে দেখ। ফুলের মধু খেয়ে, কবিতা পড়ে দিন চলে না।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "কি দেখে ভুললে তুমি? রূপ নেই। বিদ্যা নেই। অর্থ নেই। বংশ নেই। কি আছে? ক'খানা বই লেখার ক্ষমতা। হয়তো ভবিষ্যতে তাও থাকবে না। অসচ্চরিত্র ছোকরা! বিশ্বাস করে তোমার সংগে অবাধে মিশতে দিয়েছিলাম আমরা। তারই ফল দিল। সুবিধাবাদীর দল! ভেবেছে, অনেক টাকা পাবে।"

সম্পা মুখ তুলিয়া দ্বিধাশূন্য সতেজ কণ্ঠে বলিল, "এসব কথা বলে লাভ নেই। আমি তাকে ভালবাসি।"

রায়-বাড়ী শিহরিয়া উঠিয়া মরমে মরিল। না, তাহারা আধুনিক। ভালবাসা জানে তারা, মূল্যও দিতে পারে। মেয়েরা ভালবাসে, ক্ষতি নাই। কিন্তু, গোপনে থাক সে প্রেম। এমনভাবে গুরুজন সমক্ষে অনূঢ়া নিজের ভালবাসার কথা সতেজে জানাইতে পারে, রায়-বাড়ীর অভিজ্ঞতায় ছিল না। ঘরের মধ্যে নিমেষে বজ্রপাত হইল। অনেক সহ্য করিয়াছে রায়-বাড়ী, আর পারিল না। মহেন্দ্র নির্বাক ক্রোধে সহসা বাহির হইয়া গেলেন। জয়া গালে হাত দিল। ছায়া মুখর হইয়া উঠিল, "কি করলে, সম্পা? তোমার বাবার সমান বড়দাদাকে অপমান করলে?"

জয়া বলিল, "ভাল করতে যেমন এসেছিলেন! পই-পই করে বলি, তুমি এসব ছেলে-ছোকরার কথায় থেক না, থেক না। তা-ও তো পারেন না। প্রাণের টানে আসেন। তা, আমিও যাই। তবে সম্পা, যাবার আগে জানিয়ে গেলাম, ভালবাসায় পেট ভরে না। যে ভালবাসা, ভালবাসা করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছ, সে ভালবাসা থাকবে না। পুরুষের মন তো! আজ তোমাকে নিয়ে মেতেছে, কাল অন্য জুটবে। অমন ছেলের স্বভাবচরিত্র ভাল হয় না।"

ভারী পান্সীর ন্যায় হেলিতে দুলিতে জয়া স্বামী-অপমানে সতীর নজিরে প্রাণ ত্যাগ না করিতে পারিয়া ঘর ত্যাগই করিল। চপলেন্দ্রও উঠিলেন। অমিয় সকাতরে বলিল, "মেজদা, তুমিও উঠছো?"

স্বল্পভাষী চপলেন্দ্র বলিলেন, "বসে লাভ কি? সম্পা যে ভুলেই গেছে গৌতম অন্য শ্রেণীর। বাড়ীতে আমাদের কাজ হবে না। এ অসম্ভব কথা আলোচনার যোগ্য নয়।" তিনি চলিয়া গেলেন।

একটু নীরব থাকিয়া অমিয় বলিল, "বড়বৌদি অনেক সময় ঠিক কথা বলেন। প্রেম তো সাহিত্যিকের! ওরা সচ্চরিত্র হয় না। অনেক দৃষ্টান্ত তো আছে। ওদের ভালবাসা কখনও ঠিক থাকে না।"

নিখিল বলিল, "সম্পা, বুঝতে পারছ অবস্থা? এ বিয়ে করলে আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। সবাইকে ছেড়ে সুখ পাবে কি? তারপরে ও-বাড়ীতেও স্থান হবেনা হয়তো। নির্লজ্জের মত কোর না। ভেবে দেখ, কতদূর নেমেছ যে, আমাদের মুখের ওপর ভালবাসার কথা শোনাচ্ছ! বই-এর কথা মুখস্থ করে জীবন চলে না। এ জ্ঞানটুকু থাকা উচিত। সবে আমাদের অবস্থা ফিরিয়ে আনছি, এ সময়ে এ কাজ তুমি করলে কি হবে বাড়ীর?"

বিনয় এতক্ষণে কথা বলিল, "ভালোবাসা কোথায়? প্রমাণ নেই যে এ ভালবাসা খাঁটী।"

শ্রীলতা উঠিয়া চলিয়া গেল, যাইবার আগে বলিয়া গেল, "সম্পা, তুমি তো জান টাকা না থাকা কত কষ্টের। ভুল কোর না।" বিনয়ও উঠিয়া গেল। কেবল অমিয়, নিখিল ও ছায়া রহিল। অমিয় বলিতে লাগিল অবিশ্রান্তভাবে নানা যুক্তি, নানা তথ্য। ছায়া, নিখিল সমর্থন করিতে লাগিল। ছায়ার হাতে, অমিয়ের হাতে রায়বাড়ীর ভবিষ্যৎ। সকলে বিরক্ত হইয়া সম্পাকে ত্যাগ করিতে পারিলেও তারা পারেনা। নিখিল ছায়ার বুদ্ধিতে রঞ্জিতকে বিবাহে রাজী করাইয়াছে। বন্ধুর চক্ষে মানহানির ভয়ে সে তটস্থ। সুতরাং, তিন মরীয়া প্রাণী সম্পাকে লইয়া পড়িল।

সম্পা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বড়দা যে তার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছেন। নীরব তিরস্কারে, অসহ্য ঘৃণায় গৃহত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র তার চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইয়া গেলেন সম্পার আচরণ কত অশোভন, রায়বাড়ীতে কত অচল। গৃহিণী বৃহৎ কক্ষের এক পার্শ্বে নির্লিপ্তভাবে পর্যঙ্কে শায়িত ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি কোন কথা এতক্ষণ বলেন নাই। কেহ কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। অথচ সকলে বিপদের মুহূর্তে তাঁহার গৃহচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। পশ্চাতে থাকিয়া শক্তি যেন অলক্ষ্যে তিনি দিতেছিলেন।

বহুক্ষণ অমিয়দের চেষ্টার পরে গৃহিণী আসিলেন সম্মুখে। শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "সম্পা, আমি বলছি না তুমি অযোগ্যকে মনোনীত করেছ। কিন্তু, এ তো সম্ভব নয়। এত বড় কুলে জন্ম নিয়েছ, জন্মের দায়িত্ব এড়াতে চাও কেন?"

সম্পার মুখ উজ্জ্বল হইয়া নিভিয়া গেল।

"সম্পা, আমি তোমার মা। যা বলছি তোমার ভালোর জন্যে। এখন কিছু করে বোসনা চট করে। কিছুদিন সময় নিয়ে ভেবে দেখ। ভুলোনা তুমি রায়-বাড়ীর মেয়ে।"

অমিয় অস্বস্তি বোধ করিল। গরম বুলির পরে মাতার বাণী কেমন যেন নরম লাগিতেছে? কিন্তু, এখানে তো প্রতিবাদ চলিবে না। রায়-গৃহিণী পুত্র-কন্যা বা সাংসারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। করিলে তাঁহার বিচার বা নির্দেশ অমোঘ।

সম্পা উঠিল। অসহ্য এ সব আলোচনা! কোমল হৃদয়-বৃত্তিকে বাহিব করিয়া সহস্রসমক্ষে প্রকাশিত করিলে মাধুর্য থাকে না। এই মুহূর্তে মনে হইতেছে তার ও গৌতমের কবিতার মত সুন্দর প্রেম আর সুন্দর নাই। এদের কুৎসা-কীর্তনে বিকৃত অশ্লীলতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। গৌতম অসচ্চরিত্র? প্রতি-মুহূর্তে নিজেকে সংযত রাখিয়াছে যে,—দুর্বার প্রেম সম্পার মঙ্গলের নিমিত্ত নৈতিক শাসনে বক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছে। সম্পা নির্লজ্জ! যার প্রথম প্রেমের কোমল অনুভূতি পুষ্প-সুকুমার।

নিঃশব্দ পায়ে সম্পা ঘরে ফিরিল। পশ্চাতে ধাবন করিতে লাগিল রূঢ় সাবধানী বাণী, "সবাইকে ছেড়ে সুখ পাবে কি...ভালবাসা থাকে না...বাবার মৃত্যুর কারণ হ'তে চাও...ওই বাড়ীতে পারবে থাকতে...অসম্ভব...ভুল কোর না...ভুলো না তুমি রায়বাড়ীর মেয়ে"...

সম্পার নির্জন শয়নে দুই চক্ষের জলে উপাধান সিক্ত হইয়া গেল। গৌতম, গৌতম! কিন্তু, সম্পার চোখে জল কেন? সে তো দৃঢ় সংকল্প লইয়াছে গৌতমকে বরণ করিবার। রায়বাড়ীর নির্দেশ সম্পা মানিবে না। তবু, তার চোখে জল কেন? গৌতমকে সে তো বিদায় দিতেছে না।

একখানি পত্র

সম্পা,

বাড়ী ছেড়ে মেসে আসতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, অমিয়বাবু পথে আমাকে অপমান করেছিলেন। আমি নাকি তোমাকে ভোলাবার আশায় পাশের বাড়ীতে জাল পেতে অপেক্ষা করছি। আমি নাকি তোমার চোখের আড়ালে গেলেই মনের আড়াল হবো। তাই মেসে চলে এলাম। ওপরে ঠিকানা দিচ্ছি। ভেবেছিলাম দূরে দেশে চলে যাব। আমার বাড়ীতেও এ নিয়ে অশান্তি হয়েছে। কিন্তু, কাপুরুষের মত পলায়ন ভালো মনে হোল না। তুমি যখন অত সাহস দেখিয়েছ, তখন আমার সাহস তো স্বাভাবিক। অসম্ভবের সাধনা হোক আমাদের। বাড়ী একখানা দেখেছি। অভাব থাকলেও চলে যাবে আমাদের দিন। বন্ধুরা তোমার কথা শুনে দেখবার আশায় উদ্‌গ্রীব। বিয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছি। তুমি কবে আমার কাছে আসতে পারবে, চিঠি লিখে জানাও। সম্পা, সম্পা! কবে আসবে?

তোমার গৌতম

*　　*　　*　　*

এ চিঠির উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিল গৌতম আকুল আগ্রহে। সম্পা চিঠি পাইয়াছিল. জানি। কিন্তু. গৌতমের উত্তর আসে নাই! কখনও আসে নাই!!

সমাপ্ত